॥ শ্রীহরি ॥
1122▲
মুক্তি কি গুরু ছাড়া হবে না ?
क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं ? (बँगला)
স্বামী রামসুখদাস
GITA PRESS, GORAKHPUR

বিষয়-সূচী

(১) গুরু কে?

আমরা যাঁর কাছ থেকে যে কোনো বিষয়েই জ্ঞানরূপী আলোক লাভ করি, যাঁর দ্বারা আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়ে যায়, সেই বিষয়ে তিনিই আমাদের গুরু। যেমন, আমরা কারও কাছে পথের অনুসন্ধান করি, তিনি আমাদের পথ নির্দেশ করে দেন। এই পথ প্রদর্শক আমাদের গুরু হয়ে যান। আমরা তাঁকে গুরু বলে মানি, অথবা নাই মানি, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার প্রয়োজন নেই। বিবাহের সময় পুরোহিত কনের সঙ্গে বরের সম্পর্ক জুড়ে দেন। ফলে তাদের মধ্যে সারা জীবনের জন্য স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক হয়ে যায়। সেই স্ত্রী পতিব্রতা হয়ে যায়। পরে সেই পুরোহিতের কথা তাদের মনেও আসে না। আর শাস্ত্রও তাঁকে মনে রাখার কথা বলে না। তেমনই গুরু ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ জুড়ে দেন। তাতেই গুরুর কাজ শেষ হয়ে যায়। তাৎপর্য হলো, গুরুর কাজ মানুষকে ভগবানের সান্নিধ্যে এনে দেওয়া। মানুষকে নিজের সান্নিধ্যে আনা, নিজের সঙ্গে সম্বন্ধ জোড়া গুরুর কাজ নয়। অনুরূপভাবে আমাদের কাজও হলো ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত করা, গুরুর সঙ্গে নয়। সংসারে কেউ মা, কেউ বাবা, কেউ ভাইপো, কেউ বৌদি, কেউ স্ত্রী, কেউ ছেলে। সেইরকম গুরুর সঙ্গে যদি আর একটি সম্বন্ধ জোড়া হয় তো তাতে কী লাভ? আগে থেকে অনেক বন্ধন তো ছিলই, এখন আর একটা বন্ধন যুক্ত হলো। ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ তো চিরকালের স্বতঃ স্বাভাবিক। কেননা আমরা ভগবানের সনাতন অংশ— **'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ**—গীতা ১৫/৭/ **'ঈশ্বর অংস জীব অবিনাসী'** (রামচরিতমানস। উত্তরকাণ্ড ১১৭/৭/)। গুরু সেই ভুলে যাওয়া সম্পর্ককে মনে করিয়ে দেন। তিনি নতুন কোনো সম্বন্ধ যুক্ত করেন না।

আমি প্রায়ই প্রশ্ন করে থাকি যে প্রথমে পুত্র, না প্রথমে পিতা? প্রায়শই এর উত্তর পাই যে, প্রথমে হলো পিতা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, প্রথমে পুত্র, পরে পিতা। তার কারণ, প্রথমে পুত্র না জন্মালে তার পিতা তো কেউ হতে পারে না। প্রথমে সে ছিল মানুষ (স্বামী), পুত্র জন্মাবার পর তার নাম হলো পিতা। তেমনই শিষ্যের যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যায়, তখন তার পথ-প্রদর্শনকারীর নাম হয়ে যায় 'গুরু'। শিষ্যের জ্ঞান না হওয়ায় আগে তো তিনি গুরু হতে পারেন না। তাই বলা হয়েছে—

গুকারশ্চান্ধকারো হি রুকারস্তেজ উচ্চতে।
অজ্ঞানগ্রাসকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ।।

(গুরুগীতা)

অর্থাৎ, 'গু' হলো অন্ধকারের নাম এবং 'রু' হলো আলোকের নাম। সেজন্য যিনি অজ্ঞানতা রূপ অন্ধকারকে দূর করে দেন তাঁরই নাম 'গুরু'।

গুরু সম্পর্কে একটি খুব বিখ্যাত দোহা আছে—

গুরু গোবিন্দ দোউ খড়ে, কিনকে লাগূঁ পায়।
বলিহারী গুরুদেব কী, গোবিন্দ দিয়ো বতায়।।

গুরুর চমৎকারিত্ব তখনই, যখন তিনি গোবিন্দকে পরিচিত করিয়েছেন, তাঁকে সামনে এনে দিয়েছেন। গোবিন্দকে জানালেন না, অথচ গুরু বনে গেলেন এ এক নিছক প্রবঞ্চনা। কেবল গুরু হয়ে গেলে গুরুগিরির প্রমাণ হয় না। এজন্য একাকী উপস্থিত গুরুর কোনো মহিমা নেই। মহিমা সেই গুরুরই, যাঁর সঙ্গে গোবিন্দও উপস্থিত থাকেন— 'গুরু গোবিন্দ দোউ খড়ে' অর্থাৎ যিনি ভগবানকে পাইয়ে দিয়েছেন।

প্রকৃত গুরু তিনি, যাঁর হৃদয়ে শিষ্যের কল্যাণের ইচ্ছা থাকে এবং প্রকৃত শিষ্য সেই, গুরুর প্রতি যার ভক্তি থাকে—

কো বা গুরুর্যো হি হিতোপদেষ্টা
শিষ্যস্তু কো যো গুরুভক্ত এব।

(প্রশ্নোত্তরী ৭)

যদি গুরু তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ হন এবং শিষ্য আন্তরিকভাবে আজ্ঞা পালনকারী হয়ে থাকে, তাহলে শিষ্যের উদ্ধার সম্পর্কে কোনো সংশয় থাকে না।

পারস কেরা গুণ কিসা পালটা নহীঁ লোহা।
কৈ তো নিজ পারস নহীঁ, কে বীচ রহা বিছোহা।।

যদি পরশ পাথরের স্পর্শে লোহা সোনা না হয়ে যায়, তাহলে তা আসল পরশ পাথর নয় অথবা লোহা ঠিক লোহা নয়, কিংবা দুটির মধ্যে কোনো ব্যবধান আছে। তেমনই শিষ্যের যদি তত্ত্বজ্ঞান না হয় তাহলে হয় গুরুর তত্ত্বপ্রাপ্তি হয়নি, নয়তো শিষ্য আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত নয়, কিংবা মাঝখানে কোনো বাধা (কপটভাব) আছে।

❋ ❋ ❋

(২) প্রকৃত গুরু

যাঁর মধ্যে কেবল শিষ্যের কল্যাণ চিন্তা থাকে তিনিই প্রকৃত গুরু। যাঁর হৃদয়ে আমাদের কল্যাণের চিন্তা থাকে না, তিনি কি করে আমাদের গুরু হবেন? যিনি আন্তরিকভাবে আমাদের কল্যাণ চান, তাঁকে আমরা গুরু বলে মানি, বা নাই মানি এবং তিনি গুরু হয়ে থাকুন, বা না থাকুন, প্রকৃতপক্ষে তিনিই আমাদের গুরু। তাঁর মধ্যে গুরু হয়ে যাবার ইচ্ছা থাকে না, কেউ আমাকে গুরু বলে মানুক, আমার শিষ্য হয়ে যাক, এই ইচ্ছাও তাঁর থাকে না। যার মধ্যে ধনের কামনা থাকে, সে ধনদাস হয়ে যায়। সেই রকমই চেলা বানাবার ইচ্ছা যার মধ্যে থাকে সে চেলাদাস হয়ে যায়। যাঁর মনে গুরু হবার বাসনা থাকে

তিনি অন্যের কল্যাণ করতে পারেন না। শিষ্যের কাছে যে অর্থ চায় সে গুরু নয়। সে হলো পৌত্র-শিষ্য। কেননা শিষ্যের কাছে যদি অর্থ থাকে তাহলে, তার শিষ্য হলো সেই অর্থ আর অর্থের শিষ্য হলো গুরু। তাহলে বাস্তবে সে হলো পৌত্র-শিষ্য। ভেবে দেখুন, যে আপনার কাছে কিছু চায় সে কি করে আপনার গুরু হতে পারে? হতে পারে না। যে আপনার কাছে অর্থ চায়, মান-সম্মান চায়, শ্রদ্ধা চায় সে আপনার শিষ্য হয়ে যায়, গুরু হয় না। জগতের কাছে সত্যকার মহাত্মার কোনো স্বার্থ নেই। জগতেরই তাঁর কাছে বাসনা থাকে। কারও কাছেই যাঁর কোনো স্বার্থ থাকে না তিনিই প্রকৃত গুরু।

কবীর জোগী জগত গুরু, তজৈ জগত কী আস।
জো জগ কী আসা করৈ তো জগত গুরু বহ দাস।।

যিনি সত্যকার সাধু-সন্ত তাঁর গুরু হওয়ার কোনো সখ থাকে না। বরং তাঁর সখ থাকে জগতকে উদ্ধার করার। জগতকে উদ্ধার করবার স্বাভাবিক প্রকৃত একাগ্রতা তাঁর মধ্যে থাকে। আমিও ভাল সাধু-সন্তের সন্ধানে থেকেছি এবং ভাল সাধু-মহাত্মার সন্ধানও পেয়েছি। কিন্তু তিনি কখনই বলেননি যে, তুমি শিষ্য হয়ে যাও তাহলে কল্যাণ হবে। যাদের গুরু হওয়ার সখ, তারাই প্রচার করে থাকে যে গুরু পাওয়া খুবই প্রয়োজন, গুরু ছাড়া মুক্তি হয় না ইত্যাদি।

কোনো বিদ্যমান মানুষকেই যে গুরু হতে হবে, এমন কোনো বিধান নেই। শুকদেব মহারাজ হাজার হাজার বছর আগে জন্মেছিলেন। কিন্তু তিনি চরণদাস মহারাজকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। প্রকৃত শিষ্যকে গুরু নিজে থেকেই দীক্ষা দিয়ে থাকেন। কেননা শিষ্য যদি প্রকৃত শিষ্য হয়, তাহলে তাকে গুরুর সন্ধান করতে হয় না। নিজে থেকেই গুরুকে পাওয়া যায়। যার মধ্যে আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা রয়েছে, সে প্রকৃত গুরুর সন্ধান পাবেই পাবে—

জোহি কেঁ জেহি পর সত্য সনেহূ। সো তেহি মিলই ন কছু সন্দেহূ ।।
(রামচরিতমানস, বালকাণ্ড ২৫৯/৩)

লোকেরা গুরুকে খোঁজে। কিন্তু যিনি আসল গুরু, তিনি শিষ্যের সন্ধান করেন। তাঁর অন্তরে বিশেষ দয়া থাকে। যেমন, সংসারে মায়ের স্থান সবার উপরে। মা-ই সর্বপ্রথম গুরু। শিশু জন্ম নেয় মায়ের কাছে, সে মায়ের দুধ খায়, মায়ের কোলে খেলা করে। মায়ের দ্বারা পালিত হয়। মা ছাড়া শিশু জন্মাতে পারে না, থাকতে পারে না, পালিত হতে পারে না। মা তো অনেক দিন ধরে সন্তান না পেয়েই থাকেন। সন্তান না থাকায় মায়ের কোনো অসুবিধা হয়নি। এসব সত্ত্বেও মায়ের স্বভাব হলো নিজে না-খেয়ে থাকবেন কিন্তু সন্তানকে ক্ষুধার্ত রাখবেন না। তিনি নিজে কষ্ট সহ্য করেও সন্তানকে পালন করবেন। প্রকৃত গুরুও এই রকমই হয়ে থাকেন। তিনি যাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন, তাকে উদ্ধার করে দেন। তাঁর মধ্যে শিষ্যকে উদ্ধার করবার সামর্থ্য থাকে। এ জিনিস আমি নিজে দেখেছি।

একজন সাধু ছিলেন। অন্যদের শিষ্য মনে না করে তিনি তাদের মিত্র মনে করতেন। তাঁর এক মিত্র ভয়ঙ্কর অসুস্থ হয়ে খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিল। ওষুধে সে ভাল হয়নি। সেই সাধু তাকে বলেছিলেন যে, তুমি তোমার ব্যাধি আমাকে দিয়ে দাও। সে বলেছিল, আমার ব্যাধি আপনাকে কি করে দেব? সাধু তখন বলেছিলেন, যখন আমি বলছি, তুমি আপত্তি কোর না। বাধা দিও না। তোমার অর্ধেক ব্যাধি আমাকে দাও। তাঁর মিত্রটি সম্মত হওয়ায় সেই সাধু অর্ধেক ব্যাধি নিজে নিয়ে নিয়েছিলেন। তাতে ওষুধ না খেয়েই শিষ্যের ব্যাধি নিরাময় হয়েছিল। এই রকম সামর্থ্য যাঁর, তিনিই গুরু হতে পারেন। কিন্তু এই রকম সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি কাউকে শিষ্য করেননি।

গুরু মেনে নেবার পর তাঁর মহিমা সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি গোবিন্দ-এর চেয়েও বড়। তার ফল এই হয় যে, শিষ্য ভগবানের

ভজনা না করে গুরুর ভজনা করতে থাকে। এটি খুবই অনর্থকারী এবং নরকগামী করে। একটি ভাল সাধুর কথা আমি জানি। শিষ্যেরা যখন তাঁকে ভগবানের চেয়ে বড় মনে করতে আরম্ভ করল, তখন তিনি শিষ্য করা ছেড়ে দিলেন। তারপর সারাজীবন তিনি কাউকে শিষ্য করেননি। কেননা শিষ্যেরা তো ভগবানকে ধরে না, গুরুকে ধরে। গুরুর কথা শুনে শিষ্যেরা যদি ভগবানে নিমগ্ন হয়ে যায়, তো ঠিক আছে। কিন্তু তারা যদি গুরুকেই ধরে থাকে, তো তা খুবই ক্ষতিকর। শিষ্যদের নিজের প্রতি নিমগ্ন যিনি করান তিনি কালনেমি অথবা কপটমুনি। তিনি গুরু নন। তিনিই গুরু, যিনি শিষ্যদের ভগবানের দিকে নিয়ে যান। ভগবানের মতো আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী গুরু, পিতা-মাতা, বন্ধু, সমর্থ কেউ নেই—

উমা রাম সম হিত জগ মাহীঁ । গুরু পিতু মাতু বন্ধু প্রভু নাহীঁ।।

(রামচরিতমানস, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ১২/১)

ভগবানের বদলে নিজের পূজা করানো পাষণ্ডদের কাজ। যার মধ্যে শিষ্য করার ইচ্ছা, অর্থের বাসনা, বাড়িঘর (আশ্রম প্রভৃতি নির্মাণ) করার আকাঙ্ক্ষা, মান-সম্মানের ইচ্ছা, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা থাকে, তার দ্বারা অন্যের কল্যাণ তো দূরের কথা, সে নিজের কল্যাণও করতে পারে না—

শিষ শাখা সুত বিতকো তরসে, পরম তত্ত্বকো কৈসে পরসে?

তার দ্বারা লোকেদের সেই রকম দুর্দশাই হয়, কপটমুনির দ্বারা রাজা প্রতাপভানুর যেমন দুর্দশা হয়েছিল (দেখুন রামচরিতমানস, বালকাণ্ড ১৫৩-১৭৫)। কল্যাণ তাঁদের সঙ্গ থেকেই পাওয়া যায়, যাঁদের অন্তরে সকলের কল্যাণ করবার ভাবনা থাকে। যাঁদের মনে অপরের কল্যাণ ভিন্ন অন্য কোনো ইচ্ছা থাকে না, যিনি নিজে ইচ্ছারহিত, তিনিই অন্যকে ইচ্ছারহিত করতে পারেন। বাসনাসক্তের দ্বারা প্রবঞ্চনাই হয়। কল্যাণ হয় না।

এটি স্বতঃসিদ্ধ যে, যে অন্যকে দুর্বল করে সে নিজে দুর্বল। যে অপরকে সমর্থ করে সে নিজে সমর্থ। যে অন্যদের চেলা বানায়, সে নিজে সমর্থ নয়। যিনি গুরু, তিনি অন্যকেও গুরু করেন। ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই তিনি কাউকে ছোট করেন না। যে ভগবদ্ চরণে শরণাগত হয় সে সংসারে বড় হয়ে যায়। ভগবান সকলকে নিজের বন্ধু করেন, নিজের সমান করেন। কাউকে নিজের চেলা করেন না। যেমন নিষাদরাজ ছিলেন সিদ্ধ ভক্ত। বিভীষণ ছিলেন সাধক এবং সুগ্রীব ছিল ভোগী। কিন্তু ভগবান রাম তিন জনকেই তাঁর মিত্র করেছিলেন। অর্জুন তো নিজেকে ভগবানের শিষ্য বলে মনে করতেন—**'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্** (গীতা ২/৭) কিন্তু ভগবান নিজেকে গুরু মনে না করে বন্ধু বলেই মনে করতেন—**ভক্তোঽসি মে সখা চেতি'** (গীতা ৪/৩), **ইষ্টোঽসি'** (গীত ১৮/৬৪)। বেদেও ভগবানকে জীবের সখা বলা হয়েছে—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।*

(মুণ্ডক, ৩/১/১, শ্বেতাশ্বতর ৬/৪)

'সর্বদা এক সঙ্গে থাকে এবং পরস্পরের প্রতি সখা ভাবসম্পন্ন দুটি পাখি— জীবাত্মা এবং পরমাত্মা একটিই বৃক্ষ—শরীরকে আশ্রয় করে থাকে।'

যে নিজে বড় সে অন্যকেও বড় করে। যে অন্যকে ছোট করে সে নিজে ছোট। বাস্তবে যে বড় তার ছোট হতে লজ্জা হয় না। ক্ষত্রিয়দের সমাবেশে আঠার অক্ষৌহিনী সেনাদের মধ্যে ভগবান ঘোড়ার চালক হয়েছিলেন। অর্জুন বলেছিল, দুই সেনানীর মধ্যে আমার রথকে নিয়ে যাও। ভগবান শিষ্যের মতো অর্জুনের আজ্ঞা পালন করেছিলেন। এমনকি পান্ডবেরা যখন যজ্ঞ করেছিল তখন তারা সর্বপ্রথম ভগবান

---

* সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীডৌ চ বৃক্ষে।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১/১১/৬)

শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেছিল। কিন্তু সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের এঁটো পাতা তোলার কাজও ভগবান করেছিলেন। ছোট কাজ করতে ভগবানের লজ্জা হয় না। যে নিজে ছোট তারই লজ্জা হয়। তার ভয় হয় যে, কেউ বোধহয় তাকে ছোট মনে করবে। তাকে কেউ অপমান করবে।

(৩) গুরুর মহিমা

বাস্তবে গুরুর মহিমার সম্পূর্ণ বর্ণনা কেউ করতে পারে না। গুরুর মহিমা ভগবানের মহিমার চেয়েও বেশি। এজন্য শাস্ত্রে গুরুর মহিমার কথা অনেক বলা হয়েছে। তবে সেই মহিমা সততার, দম্ভ বা ধূর্ততার নয়। আজকাল দম্ভ-ধূর্ততা খুবই বেড়ে গিয়েছে এবং বেড়ে চলেছে। কে-যে ভাল আর কে খারাপ তা তাড়াতাড়ি বোঝা যায় না। যে মন্দত্ব মন্দত্বের রূপে আসে, তা দূর করা সহজ। কিন্তু যে মন্দত্ব ভালত্বের রূপ নিয়ে আসে, তাকে দূর করা খুবই কঠিন। সীতার কাছে যখন রাবণ এসেছিল, রাজা প্রতাপভানুর কাছে এসেছিল কপট মুনি এবং হনুমানের কাছে কালনেমি, তখন তাঁরা তাদের চিনতে পারেনি। তাঁরা ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলেন, কেননা তারা ছিল সাধুর বেশধারী। আজকাল গুরুর প্রতি শিষ্যদের যে রকম শ্রদ্ধা দেখা যায়, গুরুরা নিজেরা সে রকম হন না। এজন্য শ্রীজয়দয়ালজী গোয়েন্দকা বলতেন যে, আজকালের গুরুদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা হয় না। শ্রদ্ধা হয় তাঁদের চেলাদের প্রতি। তার কারণ নিজের গুরুর প্রতি চেলাদের যে শ্রদ্ধা, তা শ্রদ্ধেয়।

শাস্ত্র বলেছে যে, গুরু-মহিমা যথার্থ হলেও বর্তমানে তা প্রচারযোগ্য নয়। কেননা আজকাল দাম্ভিক-ধূর্ত লোকেরা গুরু-মহিমার সাহায্যে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করে থাকে। এতে কলিযুগ সহায়তা করে, কেননা কলিযুগ হলো অধর্মের মিত্র—**'কলিনাধর্মমিত্রেণ'** (পদ্মপুরাণ,

উত্তর. ১৯৩/৩১)। বাস্তবে গুরু-মহিমা প্রচার করার জন্য নয়। তা ধারণ করার জন্য। কোনো গুরু যদি নিজে গুরু-মহিমার কথা বলেন, গুরু-মহিমার পুস্তকের প্রচার করেন, তাহলে তাতে এটিই প্রমাণিত হয় যে, তাঁর মনে গুরু হওয়ার ইচ্ছা আছে। যাঁর মধ্যে গুরু হওয়ার ইচ্ছা থাকে তিনি অন্যের ভাল করতে পারেন না। তাই আমি গুরুকে নিবারণ করি না। নিবারণ করি ধূর্তামির। গুরুকে নিবারণ তো কেউ করতেই পারে না।

বস্তুত শিষ্যের দৃষ্টিতেই গুরুর মহিমা থাকে, গুরুর দৃষ্টিতে তা থাকে না। গুরুর দৃষ্টিতে এক রকম, শিষ্যের দৃষ্টিতে এক রকম এবং তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টিতে আর এক রকম। গুরুর দৃষ্টি হলো— আমি কিছুই করিনি যা স্বতঃ স্বাভাবিক, বাস্তবিক আমি কেবল তার দিকেই শিষ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কথাটির তাৎপর্য হলো এই যে, আমি তার স্বরূপের দিকেই তাকে সচেতন করেছি। নিজের কাছ থেকে কিছু দিইনি। শিষ্যের দৃষ্টি হলো, গুরু আমাকে সব কিছু দিয়েছেন। যা কিছু হয়েছে তা সবই গুরুর কৃপায় হয়েছে। তৃতীয় জনের দৃষ্টি হলো, শ্রদ্ধার ফলেই শিষ্যের তত্ত্ববোধ হয়েছে।

আসল মহিমা সেই গুরুর, যিনি গোবিন্দের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে দিয়েছেন। যিনি গোবিন্দের সঙ্গে মিলন ঘটান না, কেবলমাত্র উপদেশের কথাই বলেন, তিনি গুরু নন। এই রকম গুরুর মহিমা নকল, আর তা কেবল অপরকে প্রবঞ্চিত করে।

❋ ❋ ❋

(৪) গুরুর কৃপা

গুরু-কৃপা অথবা সাধুর কৃপা বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ। ভগবানের কৃপায় জীব মানব শরীর লাভ করে আর গুরুর কৃপায় ভগবানকে পাওয়া যায়। লোকেরা মনে করে যে তারা গুরু করবে তাহলে তাঁরা কৃপা

করবেন। কিন্তু এটি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা নয়। নিজেদের সন্তানদের সকলেই পালন করে। মাদী কুকুরও তার বাচ্চাকে পালন করে। কিন্তু সাধু-কৃপা খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আর কেউ শিষ্য হলো, কি হলো না, তাঁর প্রতি প্রেমপরবশ হলো, না শত্রুতা করল, সাধু এইসব দেখেন না। দীন-দুঃখীকে দেখে সাধুর হৃদয় বিগলিত হয় আর তাতেই কাজ হয়ে যায়।* জগাই-মাধাই বিখ্যাত পাপী ছিল। তারা ছিল সাধুদের প্রতি বৈরী মনোভাবাপন্ন, কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু তাদের প্রতি দয়া করে তাদের উদ্ধার করে দিয়েছিলেন।

সাধুরা সকলের প্রতিই কৃপা করেন। কিন্তু যাঁরা পরমাত্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসু, কেবল তাঁরাই সেই কৃপা লাভ করতে পারেন। যেমন, পিপাসার্ত মানুষই জলকে গ্রহণ করে থাকে। বস্তুত, নিজের উদ্ধারের জন্য আগ্রহ যত বেশি হয়, সত্য তত্ত্বের জিজ্ঞাসা যত তীব্র হয়, ততটাই সেই কৃপাকে বেশি করে গ্রহণ করে থাকে। সাধু-কৃপা এবং গুরু-কৃপা প্রকৃত জিজ্ঞাসুর প্রতি নিজে থেকেই এসে যায়। গুরু-কৃপা পাওয়া গেলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু এরকম গুরু খুবই দুর্লভ।

পরশ পাথরের স্পর্শে লোহা সোনা হয়ে যায়। কিন্তু সেই সোনার অন্য লোহাকে সোনা করার সামর্থ্য থাকে না। কিন্তু প্রকৃত গুরু যদি পাওয়া যায় তো তাঁর কৃপায় শিষ্যও গুরু হয়ে যায়। মহাত্মা হয়ে যায়—

পারস মেঁ অরু সন্ত মেঁ, বহুত অন্তরৌ জান।
বহ লোহা কঞ্চন করে, বহ করৈ আপু সমান।।

এটি হলো গুরু-কৃপার বৈশিষ্ট্য। এই গুরু-কৃপা চার রকমে হয়ে থাকে। স্মরণে, দৃষ্টিতে, শব্দে এবং স্পর্শে। যেমন কচ্ছপ বালির মধ্যে ডিম পাড়ে, কিন্তু নিজে জলের মধ্যে থেকেও সেই ডিমকে

* কৃপা এক জিনিস আর দয়া অন্য জিনিস। দয়ায় থাকে কোমলতা, কিন্তু কৃপায় কিছু শাসন থাকে। দয়াতে শাসন থাকে না। দয়ায় হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। হৃদয় বিগলিত হলেই শিষ্যের কাজ (উদ্ধার) হয়ে যায়।

মনে রাখে আর তার সেই স্মরণের ফলেই ডিম ফুটে ওঠে। সেই রকম গুরুকে মনে করা মাত্রই শিষ্যের জ্ঞান-প্রাপ্তি হয়—এটি হলো 'স্মরণ-দীক্ষা'। মাছ জলের মধ্যে নিজের ডিমের দিকে মাঝে মাঝে তাকাতে থাকে, তার তাকানোর ফলেই ডিম ফোটে। এই রকম গুরুর কৃপাদৃষ্টিতে শিষ্য জ্ঞান লাভ করে—এহলো 'দৃষ্টি-দীক্ষা'। তিতির পাখি পৃথিবীতে ডিম পাড়ে আর আকাশে শব্দ করতে করতে চক্কর দিতে থাকে। তার শব্দের ফলেই ডিম ফোটে। সেই রকম গুরু তাঁর কথার দ্বারা শিষ্যকে জ্ঞান দেন—এ হলো 'শব্দ দীক্ষা'। ময়ূরী তার ডিমের উপর বসে থাকে। তার স্পর্শে ডিম ফোটে। তেমনই গুরুর হাতের স্পর্শে শিষ্যের জ্ঞান হয়ে থাকে—এ হলো 'স্পর্শ-দীক্ষা'।

মানব-শরীর ঈশ্বরের কৃপায় পাওয়া যায়। জীব তা লাভ করে স্বর্গে অথবা নরকে যেতে পারে, আবার মুক্তও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু গুরু-কৃপা এবং সাধু-কৃপায় মানুষ স্বর্গ বা নরক লাভ করে না। তারা মুক্তি লাভ করে। কাউকে গুরু মানলেই যে গুরু-কৃপা পাওয়া যাবে তা নয়। কৃত্রিম গুরুর দ্বারা কল্যাণ হয় না। যাঁরা ভাল সাধু মহাত্মা তাঁরা যে চেলা করলে তবেই কৃপা করেন এমন কথা নয়। তাঁরা স্বতঃ এবং স্বাভাবিকভাবেই কৃপা করেন। সূর্যকে কেউ ভাল বলবে তবেই সে আলোক দেবে এমন নয়। সূর্য তো স্বতঃ এবং স্বাভাবিক ভাবেই আলোক দেয়। সেই আলোকে কেউ কাজে লাগাক বা নাই লাগাক। এরূপই, গুরু এবং সাধু-মহাত্মাদের স্বতঃ স্বাভাবিক-ভাবেই কৃপা হয়ে থাকে। যে সান্নিধ্যে আসে সে লাভ করে এবং যে না চায়, সে বঞ্চিত থাকে। যে সামনে আসে না তার কোনো লাভ হয় না। যেমন, বৃষ্টি হলে, কেউ যদি তার সামনে পাত্র রাখে তবেই সেই পাত্র ভর্তি হয়। কিন্তু পাত্রকে যদি উল্টো করে রাখা হয় তাহলে পাত্র ভর্তি হয় না এবং শুকনো থেকে যায়। সাধু-কৃপাকে গ্রহণ করবার পাত্র যেমন হয় তার সেই রকমই লাভ হয়।

সতগুরু ভূঠা ইন্দ্র সম, কভী ন রাখী কোয়।
বৈসা হী ফল নীপজৈ, জৈসী ভূমিকা হোয়।।

বৃষ্টি সর্বত্র সমানভাবে হয়, কিন্তু বীজ যেমন হয় ফলও সেই রকম জন্মায়। সেই রকম ভগবানের এবং মহাত্মাদের কৃপা সকলের প্রতি সমানভাবে বর্ষিত হয়। যার যেমন ইচ্ছা সে এ থেকে লাভ করতে পারে।

(৫) গুরুর কথার মহত্ত্ব

গুরু করলেই কল্যাণ হয় না, গুরুর কথা মানলে কল্যাণ হয়। তার কারণ গুরু হলেন শব্দ, শরীর নন—

জো তূ চেলা দেহ কো, দেহ খেহ কী খান।
জো তূ চেলা সবদ কো, সবদ ব্রহ্ম কর মান।।

গুরু শরীর নন আর শরীরও গুরু নয়—'**ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূযেত**' (শ্রীমদ্ভাগবত ১১/১৭/২৭)। তাই গুরুর কখনও মৃত্যু হয় না। গুরু যদি মারা যান তাহলে শিষ্যের কল্যাণ হবে কি করে? শরীরকে তো অধম বলা হয়েছে—

ছিতি জল পাবক গগন সমীরা। পঞ্চ রচিত অতি অধম সরীরা।।
(রামচরিতমানস, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ১১/২)

যদি কোনো হাড়-মাংসযুক্ত শরীর গুরু হয় তাহলে সে অধম। গুরুর বেশে কালনেমি রাক্ষস। এজন্য গুরুতে শরীর-বুদ্ধি মান্য করা এবং শরীরে গুরু-বুদ্ধি মান্য করা অপরাধ। সন্ত একনাথজীর চরিত্রে এই জিনিসটি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শাস্ত্রের প্রক্রিয়ানুসারে প্রথমে তীর্থ যাত্রা করা হয়। পরে উপাসনা করতে হয় এবং তারপর জ্ঞান হয়। কিন্তু একনাথের জীবনে দেখা যায় এর বিপরীত ক্রম।

তাঁর প্রথমে হয়েছিল জ্ঞান, পরে তিনি উপাসনা করেছিলেন এবং তারপর গুরু তাঁকে তীর্থযাত্রা করতে আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি যখন তীর্থযাত্রা করছিলেন তখন তাঁর গ্রাম পৈঠনের এক ব্রাহ্মণ তাঁর গুরুর কাছে দেওগড়ে এসে বলেছিলেন, 'মহারাজ, আপনার এখানে একনাথ নামে যিনি ছিলেন তাঁর ঠাকুর্দা-ঠাকুমা খুব বৃদ্ধ হয়ে গেছেন এবং একনাথের নাম করে কাঁদছেন' একথা শুনে গুরু এই ভেবে বিস্মিত হয়েছিলেন যে, একনাথ এত বছর আমার কাছে ছিল অথচ তার ঠাকুর্দা-ঠাকুমার কোনো কথা আমাকে বলেনি। তিনি একটি চিঠি লিখে ব্রাহ্মণকে দিয়ে বলেছিলেন, 'সে তীর্থযাত্রা করতে করতে যখন পৈঠনে যাবে, তখন তাকে আমার এই চিঠিটা দিও। আমি তাকে বলেছি তাই সে অবশ্যই পৈঠানে যাবে।' ব্রাহ্মণ চিঠিটা নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। একনাথ যখন ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসেছিলেন তখন তিনি ঠাকুর্দা-ঠাকুমার সঙ্গে মিলিত হতে গ্রামে যাননি। তিনি গ্রামের বাইরে অবস্থান করেন। সেই ব্রাহ্মণ একনাথকে দেখে চিনতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর ঠাকুর্দাকে হাত ধরে একনাথের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। সংযোগবশত পথেই একনাথের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ঠাকুর্দা সস্নেহে একনাথকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং গুরুর চিঠিটি বার করে বলেছিলেন 'এটি তোমার গুরুর চিঠি'। একথা শোনামাত্র একনাথ আনন্দে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি কাপড় বিছিয়ে তার উপর চিঠিটি রেখেছিলেন। সেটিকে পরিক্রমা করে দন্ডবৎ প্রণাম করেছিলেন। তারপর সেটি পড়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল 'একনাথ, তুমি ওখানেই থেকো'। একনাথ সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন এবং সারা জীবন আর কোথাও যাননি। সেখানেই ঘর নির্মিত হয়েছিল। সৎসঙ্গ শুরু হয়েছিল। ঠাকুর্দা-ঠাকুমা তাঁর কাছে এসে থাকেন। তিনি গুরুর সঙ্গে আর দেখা করতেও যাননি। চিন্তা করুন, গুরু শরীর হলেন, নাকি শব্দ হলেন? গুরুর শরীরের যখন অবসান হলো তখন তিনি

বলেছিলেন 'গুরুর মৃত্যু হলো আর শিষ্য কাঁদল তাহলে দুজনে কি জ্ঞান লাভ করেছেন?' তাৎপর্য হলো, গুরুর মৃত্যু হয় না এবং শিষ্যও কাঁদে না।

একনাথের চরিত্রে যে গুরু-ভক্তির নিদর্শন দেখা যায় সেরকম আর কোনো সাধুর চরিত্রে দেখা যায় না। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের মারাঠী ভাষায় টীকা করেছেন। তার প্রত্যেকটি অধ্যায়ের প্রারম্ভে তিনি সবিস্তারে গুরুর স্তুতি করেছেন। এই রকম গুরুভক্ত একনাথও গুরুর চেয়েও তাঁর কথাকে (আদেশকে) বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

ভগবানের কাছ থেকে লাভবান হওয়ার পাঁচটি উপায় আছে—নামজপ, ধ্যান, সেবা, আজ্ঞাপালন এবং সঙ্গ। কিন্তু সাধু-মহাত্মাদের কাছ থেকে লাভবান হওয়ার তিনটি উপায়ই উপযুক্ত—সেবা, আজ্ঞাপালন এবং সঙ্গ। তাই গুরুর নামজপ এবং ধ্যান না করে তাঁর আজ্ঞা, তাঁর নির্দেশ পালন করা উচিত। গুরুর নির্দেশ অনুসারে নিজের জীবন যাপন করাই প্রকৃতপক্ষে গুরু-পূজা এবং গুরু-সেবা। কেননা সাধু-মহাত্মাদের কাছে শরীরের চেয়েও তাঁদের সিদ্ধান্ত প্রিয়তর। সিদ্ধান্তের জন্য তাঁরা প্রাণও দিতে পারেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেন না।

গুরু শরীর নন, বস্তুত তিনি হলেন তত্ত্ব। অতএব প্রকৃত গুরু নিজের পূজা-ধ্যান করান না। তিনি ভগবানের পূজা-ধ্যানই করান। প্রকৃত সাধু নিজের আদেশ পালনও করান না। বরং এইটিই বলেন যে গীতা, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থের আদেশ পালন করো। যে গুরু তাঁর ফটো দেন, তাকে গলায় পরতে দেন, তার পূজা এবং ধ্যান করান, তিনি প্রতারণা করেন। কোথায় ভগবানের চিন্ময় পবিত্র শরীর আর কোথায় হাড়-মাংসের জড় অপবিত্র শরীর! যেখানে ভগবানের পূজা হওয়া উচিত সেখানে হাড়-মাংসের পুতুলকে পূজা করা বড়ই দোষের। যেমন, যে রাজার সঙ্গে শত্রুতা করে, তাঁর বিরুদ্ধে চলে, সে রাজদ্রোহী। তেমনই যে নিজের

পূজা করায় সে ভগবদ্‌দ্রোহী। গীতা প্রেসের সংস্থাপক, সঞ্চালক এবং সংরক্ষক জয়দয়ালজী গোয়েন্দকাকে এক সজ্জন বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর ফটো তুলতে চান। তিনি বলেছিলেন প্রথমে তোমার জুতা নিয়ে এসে আমার মাথায় বেঁধে দাও, তারপর ফটো তুলো। নিজের পূজা করাকে আমি জুতা মারার মতো মনে করি। একবার জয়দয়ালজী এক সাধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি বইতে নিজের ছবি দেন। নিজের নাম, চিত্র প্রভৃতি প্রচার করেন, তাতে কি আপনার ভাল হয়, না শিষ্যের ভাল হয়, নাকি সংসারের ভাল হয়? ভাল কার হয়? তিনি এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারেননি।

❋ ❋ ❋

(৬) গুরু হওয়ার অধিকারী কে?

গুরুর মহিমা গোবিন্দের চেয়েও অধিক বলা হয়েছে। কিন্তু এই মহিমা সেই গুরুরই, যিনি শিষ্যকে উদ্ধার করতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যা-
ন্ন মোচয়েদ্যঃ সমুপেতমৃত্যুম্‌।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৫।৫।১৮)

'যিনি সমীপবর্তী মৃত্যু থেকে মুক্ত করেন না, সেই গুরু গুরু নন, সজ্জন সজ্জন নন। পিতা পিতা নন ; মাতা মাতা নন ; ইষ্টদেব ইষ্টদেব নন এবং পতি পতি নন।'

এজন্য সন্ত-বাণীতে বলা হয়েছে—

চৌথে পদ চীন্‌হে বিনা শিষ্য করো মত কোয়।

তাৎপর্য হলো যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের মধ্যে শিষ্যকে উদ্ধার করবার শক্তি না আসছে, ততক্ষণ গুরু হয়ো না। কেননা গুরু হয়ে গেলে অথচ উদ্ধার করতে পারলে না, তাহলে খুবই দোষ হয়—

হরই সিষ্য ধন সোক ন হরঈ। সো গুর ঘোর নরক মহুঁ পরঈ॥

(রামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৯৯/৪)

সে ঘোর নরকে পতিত হয় এই জন্য যে, যে-মানুষ অন্যত্র গিয়ে কল্যাণ লাভ করে, কিন্তু তাকে নিজের শিষ্য করে নিয়ে এক জায়গায় আটকে রাখা হয়েছে। নিজের কল্যাণ করার জন্য সে মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত করেছে তাতে বড় বাধা এনে দিয়েছে। যেমন, কোনো ঘরে কুকুর ঢুকে পড়ল, আর ঘরের কর্তা দরজা বন্ধ করে দিলেন, ঘরে খাদ্যবস্তু কিছু ছিল না। ফলে কুকুর সেখানে খাবার তো কিছুই পাবে না এবং অন্যত্রও যেতে পারবে না। আজকাল শিষ্যদের এই রকম অবস্থা হয়ে থাকে। গুরুজী নিজে শিষ্যের কল্যাণ করতে পারেন না এবং তাকে অন্যত্র যেতেও দেন না। সে যদি অন্য কোনো জায়গায় চলে যায় তো তাকে বকাবকি করেন এই বলে যে, আমার শিষ্য হয়ে অন্যের কাছে যাচ্ছ! শ্রীকরপাত্রজী মহারাজ বলতেন যে, যে-গুরু নিজের শিষ্য করে নেন, কিন্তু তার উদ্ধার করেন না, তিনি পরের জন্মে কুকুর হন আর শিষ্য পোকা হয়ে তার রক্ত শোষণ করে।

মন্ত্রিদোষশ্চ রাজানং জায়াদোষঃ পতিং যথা।
তথা প্রাপ্নোত্যসন্দেহং শিষ্যপাপং গুরুং প্রিয়ে।।

(কুলার্ণবতন্ত্র)

'যেমন মন্ত্রীর দোষ রাজার এবং স্ত্রীর দোষ স্বামীর হয়ে থাকে, তেমনই শিষ্যের দোষও অবশ্যই গুরু পেয়ে থাকেন।'

দাপয়েৎ স্বকৃতং দোষং পত্নী পাপং স্বভর্তরি।
তথা শিষ্যার্জিতং পাপং গুরুমাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥

(গন্ধর্বতন্ত্র)

'যেমন স্ত্রীর দোষ এবং পাপ তার স্বামী প্রাপ্ত করে, তেমনই শিষ্যের অর্জিত পাপ গুরু অবশ্যই প্রাপ্ত করেন।'

একজন সাধুর পূর্বজন্মের সত্য ঘটনা। পূর্বজন্মে তিনি এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর বৈরাগ্য এসে যাওয়ায় তিনি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে পূর্ণ বিবাগী সাধু হয়ে গিয়েছিলেন। কয়েকজন সাধু তাঁর কাছে এসে থাকতে লাগলেন। রাজাও মনে মনে ভাবলেন, আমি এই মন্ত্রীকেই গুরু করে নিই এবং ভজন করতে থাকি। তিনি গিয়ে তাঁর শিষ্য হয়ে গেলেন। পরে গুরুর (পূর্ব মন্ত্রী) শরীরের যখন অবসান হয় তখন সেই রাজাকে মহন্ত করা হয়। মহন্ত হয়ে গিয়ে রাজা ভোগাসক্ত হয়ে গেলেন। কেননা তাঁর মধ্যে ভোগ করবার পুরাতন অভ্যাস ছিল। পরিণামস্বরূপ মৃত্যুর পর সেই রাজা নরকে যান। গুরু (পূর্ব মন্ত্রী) উচ্চলোকে গিয়েছিলেন। নরক ভোগ করবার পর রাজাকে যখন পুনর্জন্ম নিতে হয় তখন তাঁর সঙ্গে গুরুকেও জন্ম নিতে হয়। এবার গুরু তাঁকে আবার ভগবানে নিমগ্ন করেন। কিন্তু তাঁকে শিষ্য না করে মিত্র করে নেন। সারা জীবন তিনি কাউকে শিষ্য করেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, যদি গুরু শিষ্যকে উদ্ধার করতে না পারেন তাহলে তাঁকে শিষ্যকে উদ্ধারের নিমিত্ত আবার সংসারে আসতে হয়। সেজন্য তাঁরই গুরু হওয়া উচিত যিনি শিষ্যকে উদ্ধার করতে পারেন।

আজকাল গুরু শিষ্যকে ভগবানের দিকে নিয়ে না গিয়ে নিজের দিকে টেনে আনেন। তাকে ভগবানের না করে নিজের করে নেন। এটি একটি বড় অপরাধ।* একটি জীব পরমাত্মার দিকে যেতে চায়। তাকে শিষ্য করে নেওয়ায় সে গুরুতেই আটকে গেল। তাহলে সে

---

* পাপ আর অপরাধের মধ্যে প্রভেদ আছে। পাপের ফল নরক ভোগ প্রভৃতি। ভোগ করলে পাপ দূর হয়ে যায়। কিন্তু যার প্রতি অপরাধ করা হয়েছে তার প্রসন্নতা ছাড়া তার অপরাধ দূর হয় না। সেজন্য অপরাধ পাপের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর।

ভগবানের দিকে যাবে কি করে? গুরু ভগবানের দিকে যাওয়ার প্রতিবন্ধক হয়ে গেলেন। গুরুতো তিনিই, যিনি শিষ্যকে ভগবানের সমীপ করে দেন, ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস জাগ্রত করেন, যেমন—হনুমান বিভীষণের বিশ্বাসকে নিজের দিকে আকৃষ্ট না করে ভগবানের দিকে করিয়েছিলেন।

সুনহু বিভীষন প্রভু কৈ রীতি। করহিঁ সদা সেবক পর প্রীতি॥
কহহু কবন মৈঁ পরম কুলীনা। কপি চঞ্চল সবহীঁ বিধি হীনা॥
প্রাত লেই জো নাম হমারা। তেহি দিন তাহি ন মিলৈ অহারা॥
অস মৈঁ অধম সখা সুনু মোহূ পর রঘুবীর।
কীন্হী কৃপা সুমিরি গুন ভরে বিলোচন নীর॥

(রামচরিতমানস, সুন্দরকাণ্ড ৭)

শ্রীশরণানন্দজী মহারাজ লিখেছেন—

'যে উপদেষ্টা ভগবদ্ বিশ্বাসের স্থানে নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস জাগান এবং ভগবদ্ সম্বন্ধের বদলে নিজের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত করেন তিনি ঘোর অনর্থ করেন।' (প্রবোধিনী)

ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস করা অপেক্ষা ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাসে বেশি লাভ হবে, তাড়াতাড়ি লাভ হবে এবং বিশেষ লাভ হবে। সুতরাং যে গুরু নিজের প্রতি বিশ্বাস করান, নিজের সেবা করান, নিজের নাম-জপ করান, নিজের জপের ধ্যান করান, নিজের পূজা করান, নিজের উচ্ছিষ্ট দেন, নিজের পদ প্রক্ষালন করান, তিনি পতনের দিকে নিয়ে যান। তাঁর কাছ থেকে সাবধান থাকা উচিত।

ভগবানের অংশ হওয়ার ফলে প্রত্যেক মানুষের ভগবানের সঙ্গে সর্বদা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। এই সম্বন্ধ স্বতঃ-স্বাভাবিক, কৃত্রিম নয়। কিন্তু গুরুর সঙ্গে যুক্ত করা যে সম্বন্ধ তা কৃত্রিম। কৃত্রিম সম্বন্ধে কল্যাণ হয় না, তাতে বন্ধন হয়। কেননা সংসারের সঙ্গে আমরা

কৃত্রিম সম্বন্ধেই বাঁধা আছি। আপনারা ভেবে দেখুন, যাঁরা গুরু করেছে তাঁদের সকলেরই কি কল্যাণ হয়েছে? তাঁদের তত্ত্বজ্ঞান হয়েছে? ভগবান লাভ হয়েছে? জীবন্মুক্তি হয়ে গিয়েছে? কারো যদি হয়ে গিয়ে থাকে তো খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না। কিছু লোক আছেন যাঁরা গুরু করেছেন, আবার কিছু লোক আছেন যাঁরা গুরু করেননি, তবে সৎসঙ্গ করেন। আপনারা এঁদের মধ্যে কী প্রভেদ দেখেন? ভেবে দেখুন যে, গুরু করলে বেশি লাভ হয়, না সৎসঙ্গ করলে বেশি লাভ হয়? গুরু আমাদের কল্যাণ করে দেবেন এই রকম ভাব থাকলে নিজেদের সাধনায় ঢিলেমী এসে যায়। সেজন্য যাঁরা গুরু করেছেন তাঁদের মধ্যে যত রাগ দ্বেষ দেখা যায়, যাঁরা সৎসঙ্গ করেন তাঁদের মধ্যে ততটা দেখা যায় না। কেউ যদি ভাল সঙ্গ পেয়ে যান তো তিনি কারও সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করেন না। কিন্তু যিনি নিজেকে কারও শিষ্য করে নেন তিনি অন্য গুরুর শিষ্যদের সঙ্গে মারামারি করেন। যাঁরা গুরু করেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না। কেবল একটি ভ্রান্তি এই থাকে যে আমরা গুরু করে নিয়েছি, এছাড়া আর কোন পার্থক্য তাঁদের মধ্যে দেখা যায় না। তাই গুরু করলেই মুক্তি হয়ে যাবে, এমন কোন নিয়ম নেই।

গুরু হওয়া এবং গুরু করা খুবই দায়িত্বের বিষয়, এ কোনো মজা নয়। কোনো লোক কাপড়ের দোকানে গিয়ে দোকানদারকে বলল যে, আমার অমুক কাপড় চাই। দোকানদার যদি তার কাছ থেকে কাপড়ের দাম নিয়ে নেয় আর কাপড় না দেয় তাহলে সেটি কি উচিত কাজ? কাপড় যদি দিতে না পারো, তাহলে দাম নিলে কেন? আর দাম যখন নিলে, তখন কাপড় দিলে না কেন? সেইরকম শিষ্য করে নিলেন, পূজা-অর্ঘ্য নিলেন, অথচ উদ্ধার করলেন না, তো সেটি কি ঠিক? প্রথমে শিষ্য হও, তারপর উদ্ধার করব এ এক প্রবঞ্চনা। নিজের পূজা করিয়ে নিলেন, প্রণামী নিলেন, শিষ্য করে নিলেন কিন্তু

ভগবদ্ প্রাপ্তি করালেন না, তাহলে আপনি গুরু হলেন কেন? যখন গুরু হয়েছেন তাহলে ভগবদ্ প্রাপ্তি করান, আর তা যদি না করান তাহলে আপনার গুরু হওয়ার কোনো অধিকার নেই। যদি নিজে শিষ্যের কল্যাণ করতেই না পারলেন তাহলে তাকে অন্যত্র যেতে দিন? নিজে যদি কল্যাণ করতে না পারেন তাহলে আপনার তাকে আটকে রাখার কী অধিকার আছে? নিজে কল্যাণ করতে পারলেন না, আর তাকে যেতেও দিলেন না, তাহলে বেচারা শিষ্যকে তো শেষ করে দিলেন। তার মনুষ্য জন্ম তো বৃথা করে দিলেন। এখন সে তার কল্যাণ কি করে করবে? তাই যতদূর সম্ভব গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ জোড়া উচিত নয়। গুরু শিষ্য সম্বন্ধ না করে যদি সাধুদের কথা শোনো তাহলে লাভ হবে আর যদি নাই মানো তাহলে ক্ষতি হবে না। এর তাৎপর্য হলো গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক না পাতালে কেবল লাভই হবে, কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক পাতালে যদি কথা না শোনো তাহলে ক্ষতি হবে। তার কারণ, গুরু যদি প্রকৃত হন আর তাঁর একটি কথাও অগ্রাহ্য করেন, তাঁর আদেশ পালন না করেন তাহলে সেটি গুরুর প্রতি অপরাধ করা হয়। এই অপরাধ ভগবানও ক্ষমা করতে পারেন না।

শিবক্রোধাদ্ গুরুস্ত্রাতা গুরুক্রোধাচ্ছিবো ন হি।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গুরোরাজ্ঞাং ন লঙ্ঘয়েৎ।।

(গুরুগীতা)

"ভগবান শঙ্করের ক্রোধ থেকে তো গুরু রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু গুরুর ক্রোধ থেকে শঙ্করও রক্ষা করতে পারেন না। এইজন্য সর্বপ্রকারে গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করো না।'

রাখই গুর জৌঁ কোপ বিধাতা। গুর বিরোধ নহিঁ কোউ জগ ত্রাতা।।

(রামচরিতমানস, বালকাণ্ড ১৬৬/৩)

❋ ❋ ❋

(৭) প্রকৃত গুরুর দুর্লভতা

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
তমেকং দুর্লভং মন্যে শিষ্যহৃত্তাপহারকম্।।

(গুরুগীতা)

'শিষ্যের ধন অপহরণ করার গুরু অনেক, কিন্তু শিষ্যের হৃদয়ের তাপ হরণ করার মতো গুরু দুর্লভ।'

গীতা প্রাণীমাত্রেরই হিতে প্রীতির কথা বলেছেন **'সর্বভূতে হিতে রতাঃ'** (৫/২৫, ১২/৪)। সত্যকার সাধুর দৃষ্টি সকল প্রাণীর কল্যাণের দিকে নিবদ্ধ থাকে, নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য থাকে না। তাঁরা কাউকে নিজেদের চেলা করেন না, নিজের সম্প্রদায় গঠন করেন না। তাঁরা কারও কাছ থেকে কিছু নেনও না। অপরের কি করে কল্যাণ হবে সেই দিকেই তাঁদের দৃষ্টি থাকে। শুধু শিষ্যদের জন্য নয়, সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্যই তাঁরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন—

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্‌ভবেৎ।।

কারণ তাঁরা ভুক্ত ভোগী। তাই সংসারে কত দুঃখ এবং সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করলে কত সুখ তা তাঁরা জানেন। এজন্য তাঁরা চান অন্যেরাও যেন সংসারে দুঃখ থেকে মুক্তি পান এবং চিরকালের জন্য সুখ অনুভব করেন।

এই যুগে ভাল সাধু-সন্ত দেখা যায় না। আগেকার যুগেও সত্যকার মহাত্মা খুব কম ছিলেন। এখন তো তা বিশেষভাবে কম। বর্তমানে তো গুরু হওয়া এক পেশা (ব্যবসা) হয়ে গিয়েছে। তাঁরা নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য, নিজেদের মনোগতের জন্য, নিজেদের মান-সম্মানের জন্য (শরীরের জন্য মান এবং নামের

জন্য সম্মান) এবং নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য চেলা করে থাকেন। এই রকম মনোভাব চেলাদেরও থাকে।

গুরু লোভী সিষ লালচী, দোনোঁ খেলে দাঁব।
দোনোঁ ডূবা 'পরসরাম', বৈঠ পথরকী নাঁব।।

এখন নকল জিনিসের যুগ। ব্রাহ্মণ নকল, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থী, বাণপ্রস্থী, সাধু সবাই নকল। এমনকি শাক-সব্জী, ফুল-পাতা, মশলা-পাতি, দুধ প্রভৃতিও নকল। সব জিনিস যখন নকল, তখন গুরুও নকল—

মিথ্যারম্ভ দম্ভ রত জোঈ। তা কহুঁ সন্ত কহই সব কোঈ।।
নিরাচার জো শ্রুতি পথ ত্যাগী। কলিজুগ সোই গ্যানী সো বিরাগী।।

(রামচরিতমানস উত্তরকাণ্ড ১৮/২,৪)

সাধু হলেই কল্যাণ হয় না। আমি নিজে সাধু হয়ে দেখেছি। সেজন্য যে নিজের কল্যাণ চায় তার কোনো মানুষের চক্করে পড়া উচিত নয়, কাউকে গুরু করা উচিত নয়।

বাস্তবে কল্যাণ, মুক্তি, তত্ত্বজ্ঞান, পরমাত্মপ্রাপ্তি গুরুর অধীন নয়। যদি গুরু না করলে তত্ত্বজ্ঞান না হয় তাহলে পৃথিবীতে প্রথম যিনি গুরু হয়েছিলেন তাঁর তত্ত্বজ্ঞান হলো কি করে? যদি কোনো মানুষকে গুরু না করেও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এইটিই প্রমাণিত হলো যে, কোনো মানুষকে গুরু না করলেও জগদ্‌গুরু ভগবানের কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান হতে পারে। কিন্তু আজকাল তো এই প্রথারই চলন হয়েছে যে, প্রথমে চেলা হও, গুরুমন্ত্র নাও, পরে উপদেশ দেব। এই অবস্থায় গুরু করলে শিষ্যের খুবই দুর্দশা হয়। ভাব সন্নিবিষ্ট হয় না, লাভ দৃষ্ট হয় না। অন্তরের ভ্রম দূর হয় না। আর ছেড়ে দিয়ে অন্যত্রও যেতে পারে না। আমার কথা যদি কেউ শোনো তাহলে আমি বলব যে, সৎসঙ্গ করো, যতটা পার ভাল কথা গ্রহণ

করো, কাউকে গুরু করো না। যেখানেই ভাল ভাল কথা জানতে পারবে সেখান থেকে তা নিয়ে নাও। আর যেখান থেকে তা পাবে না সেখান থেকে চলে যাও। গুরু করে বাঁধা পড়ো না।

মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্বন্তরং ব্রজেৎ॥

'মধুলোভী ভ্রমর যেমন এক পুষ্প থেকে অন্য পুষ্পে চলে যায় তেমনই জ্ঞানলোভী শিষ্যও এক গুরু থেকে অন্য গুরুর দিকে যায়।'

গুরু করে নিলে তারপর কে জানে কী দশা হবে! আমি এমন কিছু লোকের সঙ্গে মিলিত হয়েছি, যাঁরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ভাল গুরু নির্বাচন করেছিলেন, কিন্তু পরে সেই গুরুদের প্রতি তাঁদের অশ্রদ্ধা জন্মায়। সেজন্য যারা নিজেদের কল্যাণ চায়, তাদের কারও সঙ্গে সম্বন্ধ জোড়া উচিত নয়। সংসারের সঙ্গে যাঁরা নিজেদের সম্বন্ধ জুড়ে নেন তাঁরা নিজেদের ভাল করতে পারেন না, অন্যের ভাল কি করে করবেন?

আজকাল আসল গুরু পাওয়া খুব কঠিন। এমন মানুষ দেখা যায় না যাঁরা তত্ত্বকে ঠিক মতো জানেন। যারা নিজেরাই তত্ত্বকে জানে না তারা শিষ্যদের কী জানাবে? সঠিকভাবে তত্ত্ব জানেন এমন গুরু আগেও খুব কম হয়েছে। আগেকার সাধুদের বই যখন পড়ি তখন পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। তিনিই সর্বাপেক্ষা বড় সাধু যাঁর মধ্যে কোনো মতদ্বন্দ্ব থাকে না, অর্থাৎ দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি কোনো মতের প্রতি যাঁর কোনো আগ্রহ থাকে না। এজন্য সাধকের কাছে সব চেয়ে বড় কথা হলো তিনি যেন শুদ্ধ অন্তঃকরণে ভগবানে মনোনিবেশ করেন। কোনো ব্যক্তিকে না ধরে যেন পরমাত্মাকেই ধরেন। ব্যক্তির মধ্যে পূর্ণতা থাকে না। পূর্ণতা আছে পরমাত্মাতেই।

আমরা যদি শুদ্ধ অন্তঃকরণে পরমাত্মার সম্মুখীন হই তাহলে তিনি যোগ, জ্ঞান, ভক্তি—সব কিছু দিয়ে দেন।*

(৮) মানুষের জন্মজাত গুরু—বিবেক

একটি মরমী কথা হলো এই যে, জগদ্গুরু ভগবান তাঁকে প্রাপ্ত করবার জন্য মনুষ্য শরীর যখন দেন, তখন সেই সঙ্গে বিবেকরূপী গুরুও দেন। ভগবান অপূর্ণ কাজ করেন না। যেমন বড় বড় অফিসার বাড়ি, গাড়ি, ভৃত্য প্রভৃতি সুবিধাগুলি পেয়ে থাকে, তেমনই ভগবান মনুষ্য শরীরের সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণের সকল সামগ্রীও দিয়ে থাকেন। তিনি মানুষদের 'বিবেক'-রূপী গুরু দেন, তার দ্বারা মানুষ সৎ-অসৎ, কর্তব্য-অকর্তব্য, ঠিক-বেঠিক প্রভৃতিকে জানতে পারে। এই বিবেকের চেয়ে আর বড়ো কোনো গুরু নেই। যে নিজের বিবেককে শ্রদ্ধা করে, তার নিজের কল্যাণের নিমিত্ত বাইরের কোনো গুরুর প্রয়োজন হয় না। যার নিজের বিবেকের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, সে বাইরের গুরু করলেও নিজের কল্যাণ করতে পারে না। তাই বাইরের গুরু করলেও কল্যাণ হয় না।

মানুষ বিবেককে যতটা গুরুত্ব দেয়, তাকে কাজে লাগায় তার বিবেক ততটাই বৃদ্ধি পায়। আর বৃদ্ধি পেতে পেতে সেই বিবেক

---

*তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়ান্তি তে।।
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।। (গীতা—১০/১০-১১)

'সদাসর্বদা আমাতে নিবিষ্ট যেসব ভক্ত প্রেমপূর্বক আমাকে ভজনা করে আমি তাদের বুদ্ধিযোগ দিই। তাতে তারা আমাকে প্রাপ্ত হয়।'

'সেই ভক্তদের কৃপা করার জন্য তাদের স্বরূপে (অস্তিত্বে) স্থিত আমি তাদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকারকে দেদীপ্যমান জ্ঞানরূপী প্রদীপের দ্বারা নষ্ট করে দিই।'

তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হয়ে যায়। বিবেকের প্রতি শ্রদ্ধা গুরু করলে হয় না, সৎসঙ্গ করলেই হয়—**'বিনু সৎসঙ্গ বিবেক ন হোঈ'** (রামচরিত-মানস, বালকাণ্ড ৩/৪) ভাল সাধু-সন্ত শিষ্য না করলেও তাঁদের সৎসঙ্গ করলে মানুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। তাঁদের আচরণ থেকে শিক্ষা লাভ হয়, তাঁদের বাণী দ্বারা শাস্ত্র রচিত হয়। তাই যেখানে সৎসঙ্গ পাওয়া যায়, নিজের উদ্ধারের পথ পাওয়া যায় সেখানে সৎসঙ্গ করা চাই। তবে যতদূর সম্ভব গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ তৈরি করা উচিত নয়। মহারাজ চতুর সিংহ ছিলেন মেবারের রাজার কাকা। তিনি সৎসঙ্গ করতেন, আর কোথাও ভাল কথা শুনলেই সেখান থেকে চলে আসতেন, কেননা এখন সেই কথা অনুযায়ী আচরণ করতে হবে। তিনি প্রতিজ্ঞা করতেন যে, এই কথাটি আর তাঁর জীবন থেকে চলে যাবে না। এইভাবে উপদেশ অনুসারে আচরণ করার ফলে তিনি ভাল সাধু হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং তাঁকে মারওয়াড়ী ভাষার বাল্মিকী বলা হতো। এইভাবে আপনারাও যদি যা ভাল কথা পাবেন তাকে গ্রহণ করেন তাহলে আপনারাও তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ হয়ে যাবেন।

(৯) কল্যাণে শিষ্যই প্রধান

গুরু যদি গদির মোহন্ত হন, তাঁর কাছে যদি লাখ লাখ টাকা থাকে, তাহলে তাঁর কাছ থেকে টাকা পাওয়ার ব্যাপারে প্রাধান্য গুরুরই থাকে। গুরু যদি শিষ্যকে মেনে নেন, তবেই শিষ্য ধনলাভ করবে। গুরুর ইচ্ছা ছাড়া শিষ্য তাঁর কাছ থেকে ধন নিতে পারবে না। এইভাবে ধন লাভে গুরুই থাকেন প্রধান। কিন্তু কল্যাণ ও বিদ্যা লাভে প্রাধান্য থাকে শিষ্যের। যদি শিষ্যের মধ্যে নিজের কল্যাণের

ক্ষুধা না থাকে তাহলে গুরু তার কল্যাণ করতে পারেন না। কিন্তু শিষ্যের যদি নিজের কল্যাণের ক্ষুধা থাকে তাহলে গুরু তাকে স্বীকার না করলেও সে তার নিজের কল্যাণ করে নেবে।

স্বামী রামানন্দ মহারাজ কবীরকে শিষ্য করতে অস্বীকৃত হওয়ায় কবীর একদিন পঞ্চগঙ্গা ঘাটের সিঁড়িতে শুয়েছিলেন। রামানন্দ মহারাজ স্নানের জন্য সেখান দিয়ে যাবার সময় অজান্তে তাঁর পা কবীরের গায়ে লাগে এবং তিনি 'রাম-রাম' বলে ওঠেন। কবীর 'রাম' নামকেই গুরুমন্ত্র বলে মেনে নিয়ে সাধনায় নিমগ্ন হয়ে যান। পরিণামে কবীর সন্তদের মধ্যে চক্রবর্তী হয়ে যান। দ্রোণাচার্য একলব্যকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করতে রাজী না হওয়ায় তিনি দ্রোণাচার্যের মূর্তি তৈরি করে তাঁকেই গুরু করে ধনুর্বিদ্যার অভ্যাস শুরু করেন। তার ফলে তিনি অর্জুনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হয়ে যান। অতএব গুরু করলেই যে কল্যাণ হবে এমন কথা নয়। তা যদি হোত, তাহলে যারা গুরু করেছে তাদের সকলেরই কল্যাণ হয়ে গেছে? তারা সকলে কি ভগবানকে লাভ করেছে? যাঁর উপদেশে, পথ প্রদর্শনে আমাদের কল্যাণ হয়, বাস্তবে তিনিই আমাদের গুরু, তাঁকে আমরা গুরু বলে মানি, বা নাই মানি, তিনি আমাদের শিষ্যত্ব মেনে নেন, বা না-ই নেন, আমরা গুরুকে চিনি বা নাই চিনি। দত্তাত্রেয় তাঁর চব্বিশজন গুরুর কথা বলেছেন। তাঁরা কি কেউ এসে বলেছিলেন, তুমি আমার শিষ্য আমি তোমার গুরু? এমনভাবেই গুরু করা উচিত, যাতে গুরু বুঝতে না পারেন যে অমুক ব্যক্তি আমার শিষ্য।

(১০) ভগবদ্‌প্রাপ্তি গুরুর অধীন নয়

যা আমরা পেতে চাই সেই পরমাত্মতত্ত্ব কোনো এক জায়গাতে সীমিত নেই। কারও অধিকারে নেই। তা যদি হোত, তাহলে তা

আমাদের কি উপকার করবে? প্রত্যেক প্রাণীর কাছে পরমাত্মতত্ত্ব নিত্যপ্রাপ্ত। যেসব মহাত্মা সেই পরমাত্মতত্ত্বকে জানেন, তাঁরা গুরু হন না, কোনো ফিস (উপোঢৌকন) নেন না, জিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রকেই তাঁরা সেটি খোলাখুলিভাবেই জানিয়ে দেন। যাঁরা গুরু হন না, তাঁরা তত্ত্ব যতটা জানাতে পারেন, যাঁরা গুরু হন, তাঁরা তা ততটা জানাতে পারেন না।

যারা বেসাতি করে তারা গুরু হতে পারে না। যারা বলে যে, প্রথমে আমার শিষ্য হও, তারপর আমি ভগবদ্ প্রাপ্তির রাস্তা দেখাব, তারা যেন ভগবানকে বিক্রি করে। এটি এক সিদ্ধান্ত যে, যে-জিনিস যত দামে বিক্রি হয় আসলে সে-জিনিসটির দাম তারচেয়ে কম। যেমন কোন ঘড়ি যদি একশ টাকায় পাওয়া যায় তো দোকানদার সেই ঘড়িটি একশ টাকায় আনেননি। যদি গুরু করলেই কোনো জিনিস পাওয়া যায় তাহলে সেই জিনিস গুরুর চেয়ে কম দামের অর্থাৎ তা গুরুর অপেক্ষা দুর্বল। তাহলে তার দ্বারা আমরা কি করে ভগবানকে পাব? ভগবান অমূল্য। অমূল্য বস্তু বিনামূল্যে পাওয়া যায়। আর যে বস্তু মূল্য দিয়ে পাওয়া যায়, সেই জিনিস মূল্য অপেক্ষা দুর্বল। তাই কেউ যদি বলেন যে, আমার চেলা হও তাহলেই আমি কথা বলব, তাহলে সেখানে নমস্কার করে চলে আসাই উচিত। বুঝে নিতে হবে যে তিনি এক কালনেমী। নকল গুরু সেজে থাকা কালনেমী রাক্ষস হনুমানকে বলেছিল—

সর মজ্জন করি আতুর আবহু। দিচ্ছা দেঁউ গ্যান জেহিঁ পাবহু॥

(রামচরিতমানস, লঙ্কাকাণ্ড-৫৭/৪)

তার আসল পরিচয় জানতে পেরে হনুমান বলেছিলেন, প্রথমে গুরু দক্ষিণা নাও, পরে মন্ত্র দিও। এরপর তাকে ল্যাজে জড়িয়ে আছাড় মেরেছিলেন।

❋ ❋ ❋

(১১) কল্যাণ প্রাপ্তির কারণ নিজের আগ্রহ

ভগবান গীতাতে স্পষ্ট করে বলেছেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।। (৬/৫)

"নিজের দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করো, নিজের পতন ঘটিয়ো না। কেননা নিজের মিত্র নিজেই এবং নিজের শত্রুও নিজেই।"

তাৎপর্য হলো, নিজের উদ্ধার এবং পতনের জন্য স্বয়ং-ই হলো কারণ, আর কেউ নয়। ভগবান যখন মনুষ্য শরীর দিয়েছেন, তখন তার কল্যাণের নিমিত্ত সকল সামগ্রীও তিনি পূর্ণ করে দিয়েছেন। এজন্য নিজের কল্যাণের জন্য অন্য কারও প্রয়োজন নেই।

গুরু, সাধু এবং ভগবানও উদ্ধার তখনই করেন, যখন মানুষ তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস করে, তাঁদের স্বীকার করে এবং তাঁদের আদেশ পালন করে। মানুষ যদি তাঁদের স্বীকার না করে, তাহলে তাঁরা কি করে উদ্ধার করবেন? যেমন, কেউ খাদ্য তো পরিবেশন করে দেবে, কিন্তু ক্ষুধা পাওয়া চাই নিজের। নিজের ক্ষুধা যদি না পায় তাহলে অন্যের পরিবেশিত ভাল খাদ্য কোন্ কাজে আসবে? তেমনই নিজের যদি আগ্রহ না থাকে তাহলে সাধু-মহাত্মাদের উপদেশ কোন্ কাজে আসবে?

গুরু, সাধু এবং ভগবানের কখনও অভাব হয় না। অনেক বড় বড় সাধু হয়েছেন, আচার্য হয়েছেন, গুরু হয়েছেন, ভগবানের অবতার হয়েছেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের উদ্ধার হয়নি। তাতে প্রমাণ হয় যে, আমরা তাঁদের স্বীকার করিনি। তাহলে আমাদের উদ্ধার ও পতনের হেতু আমরাই। যে তার উদ্ধার ও পতনের হেতু বলে অন্য কাউকে মনে করে তার কোনোকালেই উদ্ধার হবে না।

বাস্তবে মানুষ নিজেই নিজের গুরু **'আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ'** (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৭।২০)। এজন্য নিজেকেই উপদেশ দাও। অন্যের ন্যূনতা না দেখে নিজের ন্যূনতার দিকে দেখ এবং তা দূর করতে চেষ্টা করো। নিজেই নিজের গুরু হও, নিজেই নিজের নেতা হও এবং শাসকও নিজেই নিজের হও। তাৎপর্য হলো, কল্যাণ গুরুর দ্বারা হয় না, এবং ঈশ্বরের দ্বারাও হয় না, তা হয় প্রকৃত আগ্রহ থেকে। নিজের আগ্রহ না থাকলে ভগবানও কল্যাণ করতে পারেন না। তা যদি করতেন তাহলে এখনও আমরা কেন কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়েছি? গুরুর কোনো অভাব নেই, সাধু-মহাত্মার কোনো অভাব নেই এবং ভগবানেরও কোনো অভাব নেই। অভাব হলো আমাদের আগ্রহের। কল্যাণ প্রাপ্তি গুরুর অধীন নয়, সাধু-মহাত্মাদের অধীন নয় এবং ভগবানেরও অধীন নয়। এটি স্বয়ং-এর অধীন। যখন আমাদের আগ্রহ ছাড়া সর্বশক্তিমান ভগবানও আমাদের কল্যাণ করতে না পারেন, তাহলে মানুষের মধ্যে এমন কি শক্তি আছে যে আমাদের কল্যাণ করে দেবে? আমাদের মধ্যে যদি আগ্রহ না থাকে তাহলে লক্ষ লক্ষ গুরু করলেও কল্যাণ হবে না। আমাদের যদি আন্তরিক আগ্রহ থাকে তাহলে ভাল গুরু, ভাল সাধু-সন্ত পাওয়া যাবে, ভগবানকেও পাওয়া যাবে এবং পাওয়া যাবে সৎ-গ্রন্থ এবং জ্ঞান। কি করে পাওয়া যাবে, কেমন করে পাওয়া যাবে, তা ভগবানই জানেন। ফল যখন পাকে তখন টিয়া পাখি নিজে এসে তাতে ঠোকর মারে। তেমনই আমরা যদি সত্যই শিষ্য হয়ে যাই, তাহলে সত্যকার গুরু নিজে থেকেই আমাদের কাছে আসবেন। শিষ্যের গুরুকে যতটা প্রয়োজন, গুরুর শিষ্যকে প্রয়োজন তার চেয়েও বেশি। আমাদের আগ্রহ যদি প্রকৃত হয়, তাহলে কপট গুরু পেলেও ভগবান তাকে ছাড়িয়ে দেবেন। আমাদের কেউ আটকাতে পারবে না। নিয়ম হলো এই যে, যার ভিতর নিজের উদ্ধারের আগ্রহ থাকে সে কোনো

জায়গায় আটকে পড়ে না। প্রকৃত জিজ্ঞাসু যদি সৎসঙ্গ লাভ করে, তাহলে সে তৎক্ষণাৎ তাঁকে ধরে নেয়।

যদি আপনি নিজের উদ্ধার চান তাহলে তাতে কে বাধা দিতে পারে? আপনি যদি নিজের উদ্ধার না চান, তাহলে আপনার উদ্ধার কে করতে পারে? যত বড়ই গুরু বা সাধু হোন না কেন আপনার ইচ্ছা ছাড়া কেউ আপনার উদ্ধার করতে পারবে না। আপনি যদি নিজের উদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান তাহলে সাধু-মহাত্মা কেন, চোর-ডাকাতও আপনাকে সাহায্য করবে। দুষ্টেরাও আপনার সেবা করবে, সিংহ সাপেরাও আপনার সেবা করবে। শুধু তাই নয়, সারা দুনিয়াই আপনার সেবা করবে। আমি এরকম অনেকবার দেখেছি যে আন্তরিক ভাবে ভগবানে নিরত মানুষকে যদি কেউ দুঃখ দেয়, তো সেই দুঃখও তার উন্নতির সহায়ক হয়ে যায়। অন্যে তো তাকে দুঃখ দেবার উদ্দেশ্যেই কাজ করে, কিন্তু তাতে তার ভালই হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, যে ভগবানকে মানে না তার মধ্যেও যদি নিজের কল্যাণের আগ্রহ জাগ্রত হয়, তাহলে তারও কল্যাণ হয়ে যায়।

ধনীরা তাদের কাজ করে দেবার জন্য চাকর রাখেন, পূজা করবার জন্য ব্রাহ্মণকে রাখেন। কিন্তু খাওয়ার জন্য বা ওষুধ সেবনের জন্য কোনো চাকর বা ব্রাহ্মণকে রাখেন না। ক্ষুধা পেলে নিজেকেই খেতে হয়। অসুস্থ হলে নিজেকেই ওষুধ নিতে হয়। যখন খাদ্য নিজে খেলে ক্ষুধা দূর হয়, ওষুধ নিজে নিলে ব্যাধি দূর হয়, তাহলে নিজের আগ্রহ ছাড়া কল্যাণ কি করে হতে পারে? আপনারা যদি সচেষ্ট হয়ে ভগবানে নিরত হন, তাহলে গুরু, সাধু, ভগবান সকলেই আপনাকে সহায়তা করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবেন, কিন্তু কল্যাণ নিজেকেই করতে হবে। এজন্য গুরু আমাদের কল্যাণ করে দেবেন এই ধারণা মিথ্যা প্রবঞ্চনা।

মা যত দয়ালুই হোন না কেন, আপনার যদি ক্ষুধা না পায় তাহলে তিনি আপনাকে খাওয়াবেন কি করে? তেমনই, আপনার মধ্যে যদি

নিজের কল্যাণের উৎকণ্ঠা না থাকে তাহলে ভগবান পরম দয়ালু হলেও আপনার কী করতে পারেন? বস্ত্র হরণের সময় দ্রৌপদী ভগবানকে আহ্বান করেছিলেন। তাতে ভগবান বস্ত্ররূপে প্রকট হয়েছিলেন। কিন্তু জুয়া খেলার সময় যুধিষ্ঠির ভগবানকে আহ্বান করেননি। তাই তিনি আসেননি। যুধিষ্ঠিরকে বনে তের বছর কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, 'কানাই, পাণ্ডবদের প্রতি কি তোমার দয়া নেই?' ভগবান বলেছিলেন—'আমি কী করব, যুধিষ্ঠির জুয়াতে রাজ্য, ধন-সম্পত্তি সব কিছু বাজি ধরেছিল। কিন্তু আমাকে স্মরণই করেনি।'

(১২) ভগবান সকলের গুরু

ভগবান জগতের গুরু—

'কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্‌'

'জগদ্‌গুরুং চ শাশ্বতম্‌' (রামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড ৪/৯)

তিনি কেবল গুরুই নন, তিনি গুরুদেরও পরম গুরু—

স ঈশঃ পরমো গুরোর্গুরুঃ, (শ্রীমদ্ভাগবত ৮/২৪/৪৮)

'ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্‌' (গীতা ১১/৪৩)

রাজা সত্যব্রত ভগবানকে বলেছেন—

অচক্ষুরন্ধস্য যথাগ্রণীঃ কৃত-
স্তথা জনস্যাবিদুষোঽবুধো গুরুঃ।
ত্বমর্কদৃক্‌ সর্বদৃশাং সমীক্ষণো
বৃতো গুরুর্নঃ স্বগতিং বুভুৎসতাম্‌।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৮/২৪/৫০)

'যেমন একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে পথ প্রদর্শন করে, তেমনই অজ্ঞানী জীব অজ্ঞানীকেই নিজের গুরু করে নেয়। আপনি সূর্যের ন্যায় স্ব-প্রকাশ এবং সকল ইন্দ্রিয়ের প্রেরক। আমি আত্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসু আপনাকেই গুরু রূপে বরণ করে নিচ্ছি।'

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বলেছেন—

শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতো যো হৃদি স্থিতঃ।
তমৃতে পরমাত্মানং তাত কঃ কেন শাস্যতে।।

(বিষ্ণুপুরাণ ১/১৭/২০)

'হৃদয়ে স্থিত ভগবান বিষ্ণুই তো সম্পূর্ণ জগতের উপদেশ। হে তাত! সেই পরমাত্মাকে ছেড়ে দিয়ে আর কে কাকে কী শেখাতে পারে? শেখাতে পারে না।'

ভগবান জগতের গুরু এবং আমরাও জগতের ভিতরে থাকি। অতএব বাস্তবে আমরা গুরু থেকে বিচ্যুত নই। আমরা প্রকৃত মহান গুরুর শিষ্য। কলিযুগে বড় বিপদ তো গুরু থেকেই, কিন্তু জগদ্‌গুরু ভগবানের কাছ থেকে কোনো বিপদ নেই। সেখানে কেবল লাভই আছে, কোনো লোকসান নেই। তাই ভগবানকে গুরু মেনে নিন এবং তাঁর গীতা পড়ুন। গীতানুসারে যদি আমরা জীবনচর্যা করি তো আমাদের অবশ্যই কল্যাণ হবে। কৃষ্ণ, রাম, শঙ্কর, হনুমান, গণেশ, সূর্য প্রভৃতি যে কোনো একজনকে আমরা গুরু করতে পারি। গজেন্দ্র বলেছেন—

যঃ কশ্চনেশো বলিনোঽন্তকোরগাৎ
প্রচণ্ডবেগাদভিধাবতো ভৃশম্।
ভীতং প্রপন্নং পরিপাতি যদ্ভয়া-
ন্মৃত্যুঃ প্রধাবত্যরণং তমীমহি।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৮/২/৩৩)

'প্রচণ্ড বেগে ধাবমান অত্যন্ত বলশালী কালরূপী সাপে ভয়ভীত শরণাগতকে যে ঈশ্বর রক্ষা করেন আর যাঁর ভয়ে ভীত হয়ে মৃত্যুও পলায়ন করে, সেই ঈশ্বরেরই আমি শরণ নিই, তাঁকেই গ্রহণ করি।'

গজেন্দ্রের কথার তাৎপর্য হলো এই যে, ঈশ্বর কেমন, কী তাঁর নাম—এসব আমি জানি না। কিন্তু ঈশ্বর যেই হোন আমি তাঁরই শরণাগত। এইভাবে আমরাও যদি ঈশ্বরের শরণ নিই তাহলে তিনি গুরু পাঠিয়ে দেবেন অথবা নিজেই গুরু হয়ে যাবেন।

আমরা ভগবানের অংশ **'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫/৭) ; সুতরাং তিনিই আমাদের গুরু, মাতা, পিতা সব কিছু। বাস্তবে গুরুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক জুড়তে হয় না, সম্পর্ক জুড়তে হয় ভগবানের সঙ্গেই। তিনিই বাস্তবিক গুরু, যিনি ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে দেন। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনা করতে কারও সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার নেই। জীব মাত্রেরই ভগবানের সঙ্গে স্বতন্ত্র সম্পর্ক আছে। তার জন্য কোনো দালালের দরকার হয় না। আমরা প্রথমে গুরু করব, তারপর গুরু ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ জুড়ে দেবেন, তাহলে তো ভগবান আমাদের থেকে এক পুরুষ দূরে হয়ে গেলেন। আমরা প্রথম থেকেই যদি ভগবানের সঙ্গে সোজা যুক্ত হয়ে যাই তাহলে মধ্যখানে আর দালালের প্রয়োজন হয় না। আমরা না চাইলেই আমাদের মুক্তি জোর করে এসে যাবে—

অতি দুর্লভ কৈবল্য পরম পদ। সন্ত পুরান নিগম আগম বদ।।
রাম ভজত সোই মুকুতি গোসাঈঁ। অনইচ্ছিত আবই বরিআঈঁ।।

(রামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১১৯/২)

এজন্য ভগবদ্ গীতায় বলেছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।

(গীতা ৯/৩৪, ১৮/৬৫)

'তুমি আমার ভক্ত হয়ে যাও, আমাতে তদ্‌গত হয়ে যাও, আমার পূজক হয়ে যাও এবং আমাকে নমস্কার কর।'

সর্ব ধর্মান্‌পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

(গীতা ১৮/৬৬)

'সমস্ত ধর্মের আশ্রয় ত্যাগ করে তুমি কেবল আমরাই শরণাশ্রিত হও।'

ভগবান গুরু না হয়ে তাঁর শরণ নিতে বলেন।

(১৩) জগদ্‌গুরু ভগবানের ঔদার্য

ভগবানের গুণ অনন্ত। কেউ তা পারাপার করতে পারে না। শাস্ত্রে ভগবানের যত গুণ আজ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে, মহাত্মারা তার যত বর্ণনা করেছেন, সেগুলি সব যুক্ত করেও তা অপূর্ণ। ভগবানের পরম ভক্ত তুলসীদাসও বলেন—**'রামু ন সকহিঁ নাম গুন গাঈ'** (রামচরিত-মানস, বালকাণ্ড ২৬/৪)। সাধুদের বাণীতেও আছে যে, নিজের শক্তি স্বয়ং ভগবানও জানেন না। এই রকম অনন্ত গুণ বিশিষ্ট ভগবানে ন্যূনপক্ষে তিনটি প্রধান গুণ আছে—সর্বজ্ঞতা, সর্বসমর্থতা এবং সর্বসুহৃত্তা। তাৎপর্য হলো, ভগবানের সমান কেউ সর্বজ্ঞ নয়, সর্ব সমর্থ নয় এবং সর্ব সুহৃদ (পরম দয়ালু) নয়। এমন ভগবান থাকা সত্ত্বেও আপনারা দুঃখ পাচ্ছেন, আপনাদের মুক্তি হচ্ছে না, তাহলে কি গুরু আপনাদের মুক্ত করে দেবেন? গুরু কি ভগবানের চেয়েও অধিক তত্ত্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং দয়ালু? নিছক প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের মধ্যে নিজেদের কল্যাণের জন্য লালসা জাগ্রত না হচ্ছে, ততক্ষণ ভগবানও আপনাদের কল্যাণ করতে পারবেন না। তাহলে গুরু কেমন করে করবেন?

আপনারা গুরুর মধ্যে, সাধু মহাত্মাদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য দেখেন, তাও তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নয়, তা ভগবানের কাছ থেকে পাওয়া এবং আপনাদের মেনে নেওয়া। যেমন কেউ যদি মিষ্টান্ন তৈরি করে তো তার মধ্যে মিষ্টতা থাকে চিনির, তেমনই যেখানেই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা সবই ভগবানের। ভগবান গীতাতে বলেছেনও—

যদ্যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্।।

(১০/৪১)

'যেখানেই ঐশ্বর্যযুক্ত, শোভাময় এবং বলশালী প্রাণী তথা পদার্থ আছে সেই সমস্তকেই তুমি আমারই তেজ যোগ অর্থাৎ সামর্থ্যের অংশ থেকে উৎপন্ন বলে জানবে।'

ভগবানের সঙ্গে বিরোধিতা করে রাক্ষসেরাও ভগবানের কাছ থেকেই শক্তি সংগ্রহ করে* আর ভগবানের ভজনা যাঁরা করেন তাঁরা কি ভগবানের কাছ থেকে শক্তি লাভ করবেন না? আপনারা যদি ভগবানের সান্নিধ্যে এসে যান তাহলে কোটি কোটি জন্মের পাপ দূর হয়ে যাবে।** কিন্তু আপনারা যদি তাঁর সান্নিধ্যে না যান তাহলে পাপ কি করে দূর হবে? ভগবান তাঁর শত্রুদের শক্তি দেন, প্রেমিকদেরও শক্তি দেন এবং উদাসীদেরও শক্তি দেন। ভগবানের সৃষ্ট পৃথিবী দুষ্ট-সজ্জন, আস্তিক-নাস্তিক, পাপী-পুণ্যাত্মা সকলকেই থাকবার স্থান দেয়। তাঁর প্রদত্ত অন্ন সকলের ক্ষুধা নিবারণ করে। তাঁর দেওয়া জল সকলের তৃষ্ণা নিবারণ করে। তাঁর সৃষ্ট বায়ুতে সকলে শ্বাস গ্রহণ করে। প্রচণ্ড দুষ্ট, সবচেয়ে বড় পাপীর জন্যও ভগবানের দয়া সমানভাবে

---

* হনুমান রাবণকে বলেন—

জাকে বল লবলেস তেঁ জিতেহু চরাচর ঝারি।
তাসু দূত মৈঁ জা করি হরি আনহু প্রিয় নারি।।

(রামচরিতমানস, সুন্দরকাণ্ড ২১)

** সনমুখ হোই জীব মোহি জবহীঁ। জন্ম কোটি অঘ নাসহিঁ তবহীঁ।।

(রামচরিতমানস, সুন্দরকাণ্ড ৪৪/১)

বর্ধিত হয়। আমরা যদি বাড়িতে একটি বাল্ব লাগাই তাহলে তার জন্যও খরচ দিতে হয়। কিন্তু ভগবানের তৈরি সূর্য এবং চন্দ্র কি কখনও পয়সা চেয়েছে? জলের একটি পাইপ লাগালেও পয়সা দিতে হয়, কিন্তু ভগবানের সৃষ্টি নদীগুলি দিন-রাত বয়ে চলেছে। তার জন্য কি কেউ কখনও পয়সা চেয়েছে? থাকবার জন্য যদি সামান্য একটু জমি নেন তবে তার জন্যও অর্থ লাগে, কিন্তু ভগবান থাকবার জন্য এত বড় পৃথিবী দিয়েছেন। তাঁর জন্য কি কখনও ভাড়া চেয়েছেন? যদি তার জন্য ভাড়া চান, তবে তা দেবার ক্ষমতা কার আছে? যাঁর তৈরী সৃষ্টি এত উদার, তিনি নিজে কতই না উদার!

একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। এক ভদ্রলোক একাদশীর ব্রত করেছিলেন। দ্বাদশীর দিন কাউকে ভোজন করিয়ে পারণ করার কথা। কিন্তু কাউকে পাওয়া যায়নি। বৃষ্টি হচ্ছিল। খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত একজন বৃদ্ধ সাধুকে পাওয়া গিয়েছিল। খাওয়ার জন্য তাঁকে বাড়িতে ডাকা হয়। তাঁকে বসিয়ে তাঁর সামনে যখন খাবার পরিবেশন করা হয় তখন সাধুটি তৎক্ষণাৎ খেতে শুরু করেন। সেই ভদ্রলোক তখন জিজ্ঞাসা করেন যে, 'মহারাজ, আপনি কৈ ভগবানকে তো উৎসর্গ করলেন না।' সাধুটি বলেন, 'ভগবান আবার কে? তুমি এক মূর্খ, কিছুই বোঝ না।' এই কথা শুনেই ভদ্রলোক সাধুর সামনে থেকে খাবারের পাতা টেনে নেন এবং বলেন, 'ভগবান যদি কেউ না হন তাহলে আপনি কে? আমি তো ভগবানের সম্বন্ধেই আপনাকে ভোজন করাচ্ছি।' সেই সময় আকাশবাণী হয়েছিল, 'আরে আমার নিন্দা করতে করতে এই সাধু বৃদ্ধ হয়ে গেছে। তবু আজ পর্যন্ত আমি একে খাদ্য দিয়ে এসেছি। তুমি একবারের জন্যও একে খেতে দিতে পারছ না, আর নিজেকে আমার ভক্ত বলছ। আমি যদি খেতে না দিই তাহলে এ কত দিন বেঁচে থাকতে পারে?' আকাশবাণী শুনে তাঁর খুব দুঃখ হয়েছিল। তিনি সাধুর কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রেমের সঙ্গে তাকে ভোজন করিয়েছিলেন।

ঐসো কো উদার জগ মাহীঁ।
বিনু সেবা জো দ্রবৈ দীন পর রাম সরিস কোউ নাহীঁ।।
(বিনয়পত্রিকা ১৬২)

এমন পরম উদার ভগবান থাকতে আমরা দুঃখ ভোগ করছি আর গুরু আমাদের সুখী করে দেবেন, উদ্ধার করে দেবেন—এ কত বড় প্রবঞ্চনা! নিজেদের উদ্ধারের জন্য আমরা নিজেরাই যেন প্রস্তুত হয়ে যাই। ব্যাস, প্রয়োজন কেবল এইটুকুই।

ভগবান খুবই দয়ালু। তিনি যখন সকলের জীবন-নির্বাহের ব্যবস্থা করেন, তখন কল্যাণের ব্যবস্থা কি করবেন না? তাই আপনারা আন্তরিকভাবে কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করুন আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন 'হে নাথ। আমার কল্যাণ যেন হয়। উদ্ধার যেন হয়। আমি জানি না কল্যাণ কী। কিন্তু আমি যেন কোনো জায়গায় ফেঁসে না যাই। চিরদিনের জন্য সুখী হয়ে যাই। হে নাথ! আমি কী করব?' ভগবান সত্যকার প্রার্থনা অবশ্যই শোনেন—

সচ্চে হৃদয়সে প্রার্থনা, জব ভক্ত সচ্চা গায় হৈ।
তো ভক্তবৎসল কান মেঁ, বহ পহুঁচ ঝট হী জায় হৈ।।

নিজেদের কল্যাণের জন্য আমাদের যত চিন্তা, তার চেয়েও বেশি চিন্তা ভগবানের এবং সাধু-মহাত্মাদের। শিশুদের নিজেদের জন্য চিন্তা, তাদের জন্য মায়েদের চিন্তা আরও বেশি। কিন্তু শিশুরা একথা বোঝে না।

হেতু রহিত জগ জুগ উপকারী। তুম্হ তুম্হার সেবক অসুরারী॥
(রামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৪৭/৩)

যে আন্তরিকভাবে ভগবানের দিকে যায় তার সহায়তার জন্য সকল সাধু-মহাত্মা উৎকণ্ঠিত থাকেন। সাধুদের হৃদয়ে সকলের জন্য অপার দয়া পরিপূর্ণ থাকে। শিশু ক্ষুধার্ত থাকলে তাকে খাদ্য দেওয়ার কথা কার মনে না আসে?

যদি কেউ অন্তরের সঙ্গে নিজের কল্যাণ চায়, তাহলে ভগবান

অবশ্যই তার কল্যাণ করেন। আমাদের হিত সাধনের জন্য ভগবানের সমান কোনো গুরু নেই—

উমা রাম সম হিত জগ মাহীঁ। গুরু পিতু মাতু বন্ধু প্রভু নাহীঁ।।
সুর নর মুনি সব কৈ যহ রীতী। স্বারথ লাগি করহিঁ সব প্রীতি।।

(রামচরিতমানস, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ১২/১)

❊ ❊ ❊

(১৪) গুরু-বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন—গুরু ছাড়া উদ্ধার কেমন করে হবে ; কেননা রামায়ণে আছে—**'গুরু বিনি ভব নিধি তরই ন কোঈ'**

(রামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৯৩/৩)

উত্তর—সেই রামায়ণে একথাও আছে—

গুর সিষ বধির অন্ধ কা লেখা। এক ন সুনই এক নহিঁ দেখা।
তরই সিষ্য ধন সোক ন হরই। সো গুর ঘোর নরক মহুঁ পরঈ।।

(রামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৯৯/৩-৪)

তাৎপর্য হলো ভণ্ড গুরু দ্বারা উদ্ধার হবে না। তৈরী করা গুরু দ্বারা কোন কাজ হবে না। কোন না কোনও সাধুর কথা মেনে নিলে তবেই উদ্ধার হবে, আর যাঁর কথা মানলে উদ্ধার হবে, তিনিই হলেন আমাদের গুরু। শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে দত্তাত্রেয় নিজের চব্বিশ জন গুরুর বর্ণনা করেছেন। তাৎপর্য হলো মানুষ যে কোনো লোকের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের উদ্ধার করতে পারে। অতএব গুরু করার প্রয়োজন নেই। বরং প্রয়োজন হলো শিক্ষা নেওয়ার। যাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নিলে, যাঁর কথা শুনলে আমাদের উদ্ধার হয়ে যায়, তিনিই আমাদের গুরু—তাঁকে আমরা গুরু তৈরি না করলেও। যদি আমরা কথা না শুনি তাহলে গুরু করলেও কল্যাণ হবে না, বরং পাপ হবে, অপরাধ হবে।

আজকাল এক সঙ্গে অনেক লোককে দীক্ষা দেওয়া হয় এবং

সামূহিক রূপে সকলকে নিজের চেলা করে নেওয়া হয়। চেলাদের কল্যাণ চিন্তা গুরু করেন না আর চেলাদেরও নিজেদের কল্যাণের জন্য আগ্রহ থাকে না। গুরু চেলাদের কল্যাণ করতে পারেন না এবং চেলারাও অন্যত্র যেতে পারেন না। সুতরাং চেলা বানিয়ে সেই সব লোকের কল্যাণে বাধা সৃষ্টি করা হলো।

প্রশ্ন—এই কথা প্রচলিত যে গুরু ছাড়া কল্যাণ হয় না। অতএব গুরু করা আবশ্যক নয় কি?

উত্তর—যার ভাল-মন্দ জ্ঞান আছে সে অ-গুরু হলো কি করে? ভাল-মন্দের জ্ঞান (বিবেক) সকলের মধ্যে আছে। ভগবানের নাম জপ করা উচিত। তাঁকে স্মরণ করা উচিত, কাউকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয় ইত্যাদি কথা সকলেই জানেন। যাঁর কাছ থেকে এই জ্ঞান হয়েছে তিনিই গুরু। তাঁকে আমরা জানি বা না-জানি, মানি বা না-মানি।

যিনি গুরু করলেন, কিন্তু গুরুর কথা মানলেন না, তিনিই তো নি-গুরু। তাঁর অপরাধ হয়। যিনি গুরুই করেননি তাঁর অপরাধ কি করে হবে?

গুরু করলেই কল্যাণ হয়ে যাবে, এমন কোনো বিধান নেই। কল্যাণ নিজের আগ্রহে হয়, গুরু করলে হয় না।

ভগবান জগতের গুরু—**'কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্।'** আপনারা জগতের বাইরে নয়। তাহলে আপনারা নি-গুরু কি করে হলেন? এইজন্য ভাল মহাত্মাদের সৎসঙ্গ করুন এবং তাঁদের কথা কাজে লাগান। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ তৈরির কথা ঠিক নয়। বাস্তবে যাঁরা জীবন্মুক্ত, তত্ত্বজ্ঞ, ভগবদ্প্রেমী মহাত্মা তাঁরা কল্যাণের কথা বলেন, চেলা করেন না। তাঁদের গুরু না করে তাঁদের কথা যত শুনবেন ততই লাভ হবে। আর কোনো কথা যদি বা মানেন তাতে পাপ হবে না। কিন্তু গুরু করার পর যদি কথা না শোনেন তবে তাতে কেবল পাপ নয়, অপরাধও হবে।

প্রশ্ন—বলা হয় গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র নিলে সেই মন্ত্রে শক্তি আসে।

উত্তর—যিনি মন্ত্র দেবেন তাঁর মধ্যে যদি শক্তি থাকে তবেই না মন্ত্রে শক্তি আসবে। যাঁর নিজের মধ্যেই শক্তি নেই, তাঁর দেওয়া মন্ত্রে শক্তি কি করে আসবে? এইজন্যই বলা হয়েছে—

বচন আগলে সন্ত কা, হরিয়া হস্তী দন্ত।
তাখ ন টূটে ভরম কা, সৈঁধে হী বিনু সন্ত।।

অর্থাৎ অভিজ্ঞ সন্তের কথা হাতির দাঁতের মতো হয়ে থাকে। তা অজ্ঞানরূপী দ্বারকে ভেঙে ফেলে। হাতি তার দাঁত দিয়ে দুর্গের দ্বার ভেঙে ফেলে। কিন্তু কেউ যদি হাতি ছাড়াই তার দাঁত দিয়ে দ্বার ভাঙতে চায়, তো তা সে পারবে না। তার কারণ বাস্তবে শক্তি থাকে হাতিতে, কেবল তার দাঁতে নয়। এই রকম শক্তি সন্তের অভিজ্ঞতায় থাকে, কেবল তাঁর কথায় থাকে না।

আজকাল গুরু হওয়ার, নিজের সম্প্রদায় গড়ে তোলার সখ তো আছে, কিন্তু জীবের কল্যাণ হোক এই দিকে খেয়াল খুব কম থাকে। নিজের সম্প্রদায় অনুসারে মন্ত্র দিলে নিজের গোষ্ঠী তো তৈরি হয়ে যায়, কিন্তু তত্ত্বপ্রাপ্তিতে কঠিনতা হয়ে থাকে। তত্ত্বপ্রাপ্তি তখনই হয় যখন নিজের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, রুচি এবং যোগ্যতা অনুসারে সাধনা করা হয়। সব উপাসনাই ঠিক। কিন্তু যে উপাসনা স্বাভাবিক সেইটিই প্রকৃত এবং যা চেষ্টাকৃত, তা নকল। আজকাল যাঁরা সাধনার পথে অগ্রসর হতে চান তাঁদের অনেক ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়। গুরু কৃষ্ণ-মন্ত্র দিয়েছেন, কিন্তু আমার মন তো রাম-মন্ত্রের দিকে। এখন কী করি? এই বিষয়ে আমার প্রার্থনা হলো এই যে যদি আপনার রুচি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস রাম-মন্ত্রে হয়, তবে রাম-মন্ত্রই জপ করা উচিত। গুরু যদি অন্য মন্ত্র দিয়ে থাকেন, তাহলে এক মালা সেই মন্ত্র জপ করুন। কিন্তু অন্য সময় নিজের রুচি মতো মন্ত্রই জপ করা উচিত। সেই উপাসনাই সিদ্ধ হয় যাতে স্বতঃ স্বাভাবিক রুচি হয়ে থাকে। উপর থেকে চাপান উপাসনা তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয় না।

যে মন্ত্রের প্রতি আপনার শ্রদ্ধাভাব বেশি হবে সেই মন্ত্রেই স্বতঃই শক্তি এসে যাবে। তার কারণ মূলত শক্তি পরমাত্মার, কোনো ব্যক্তির নয়। অগস্ত্য, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি বড় বড় মুনি ঋষির মধ্যে যে শক্তি ছিল সেগুলি তাঁরা গুরুর কাছ থেকে পাননি। তাঁরা তা পেয়েছিলেন নিজেদের তপস্যার বলে ভগবানের কাছ থেকে। ভগবানের শক্তি সর্বত্র, নিত্য এবং সকলের জন্য। তাঁর মধ্যে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। যার ইচ্ছা সে সেই শক্তি লাভ করতে পারে।

প্রশ্ন—গুরু ছাড়া কুন্ডলিনী কি করে জাগ্রত হবে?

উত্তর—কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না। কল্যাণ হয় না। কোনো নিদ্রিত সর্পিণীকে যদি খোঁচান হয় তাহলে কি মুক্তি হবে? শ্রীশরনান্দজী মহারাজকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল যে কুন্ডলিনী বিষয়ে আপনি কী জানেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আমি এইটি জানি যে কুণ্ডলিনীর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। কুণ্ডলিনী ঘুমিয়ে থাকুক বা জেগে থাকুক তাতে আমার কী? কুণ্ডলিনী শরীরে আছে। স্বরূপে নেই। তাহলে কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে সাধক শরীরকে অতিক্রম করবে কি করে? শরীরকে অতিক্রম করতে না পারলে কল্যাণ হবে কি করে? শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হলে তবেই তো কল্যাণ হয়।

প্রশ্ন—কিছু লোকের তো গুরুর দ্বারা কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত প্রভৃতি করার ফলে অলৌকিক অনুভূতি হয়েছে, সেটা কী?

উত্তর—চমৎকারিতা তো কিছু হয়, কিন্তু তাতে কল্যাণ হয় না। কল্যাণ তো জড়তা (শরীর-সংসার) থেকে উপরে উঠলেই হয়।

প্রশ্ন—আমরা গুরুর কাছ থেকে কণ্ঠী তো নিয়েছি, এখন যদি তা থেকে শ্রদ্ধা চলে যায়, তাহলে কি কণ্ঠী তাঁকে ফেরত দিয়ে দেব?

উত্তর—কণ্ঠী ফেরত দেওয়ার কথা আমি কখনও বলি না। আমি এই কথাই বলি যে প্রতিদিন গুরুমন্ত্র নিয়ে এক মালা জপ কর। আর বাকি সময় যাতে শ্রদ্ধা আছে সেই মন্ত্র জপ কর এবং সৎসঙ্গ স্বাধ্যায় কর।

প্রশ্ন—প্রথমে গুরু করেছিলাম। এখন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নেই। তাঁকে ত্যাগ করলে পাপ হবে না তো?

উত্তর—যখন আপনার মনে গুরুকে ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা হয়েছে, তাঁর উপর থেকে শ্রদ্ধা চলে গিয়েছে, তখন গুরুকে ত্যাগ করা তো হয়ে গিয়েছে। তবে সেই গুরুর নিন্দা করবেন না এবং তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধও রাখবেন না।

অর্থের প্রতি যাঁর লোভ, নারীর প্রতি যাঁর মোহ, কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কে যিনি জ্ঞানহীন, যিনি খারাপ রাস্তায় চলেন— এই রকম গুরুকে ত্যাগ করায় কোনো পাপ, দোষ হয় না। শাস্ত্রে এরকম গুরুকে ত্যাগ করবার কথা বলা হয়েছে—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে*।।

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১৭৮/৪৮)

'যদি গুরু অহঙ্কারবশত কর্তব্য এবং অকর্তব্যের জ্ঞান খুইয়ে ফেলেন এবং কু-পথে চলতে থাকেন, তাহলে তাঁকে ত্যাগ করবার বিধান আছে।'

জ্ঞানহীনো গুরুস্ত্যাজ্যো মিথ্যাবাদী বিকল্পকঃ।
স্ববিশ্রান্তিং ন জানাতি পরশান্তিং করোতি কিম্।।

(সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহ ; গুরুগীতা)

'জ্ঞানরহিত, মিথ্যাবাদী এবং ভ্রম সৃষ্টিকারী গুরুকে ত্যাগ করে দেওয়া উচিত। কেননা যিনি নিজে শান্তি লাভ করেননি তিনি অন্যকে শান্তি কেমন করে দেবেন?'

পতিতা গুরবস্ত্যাজ্যা মাতা চ ন কথঞ্চন।
গর্ভধারণপোষাভ্যাং তেন মাতা গরীয়সী।।

(স্কন্দপুরাণ, মা০ কৌ০ ৬/৭ ; মৎস্যপুরাণ ২২৭/১৫০)

---

* এই পদটি বাল্মীকি রামায়ণ, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতিতে কিছুটা পাঠভেদসহ উল্লেখিত হয়েছে।

'পতিত গুরুও ত্যাজ্য, কিন্তু মা কোনো ভাবেই ত্যাজ্য নন। গর্ভাবস্থায় ধারণ-পোষণ করার জন্য মাতার গৌরব গুরুজনদের চেয়েও বেশি।'

প্রশ্ন—স্ত্রী কি কাউকে গুরু করতে পারে?

উত্তর—স্ত্রীর কাউকে গুরু করা উচিত নয়। যদি করে থাকে তাহলে ছেড়ে দেওয়া উচিত। পতি হলো স্ত্রীর গুরু। শাস্ত্রে আছে—

গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেব গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্বস্যাঽভ্যাগতো গুরুঃ।।

(পদ্মপুরাণ ৫১/৫১ ; ব্রহ্মপুরাণ ৮০/৪৭)

'অগ্নি দ্বিজাতির গুরু, ব্রাহ্মণ চারটি বর্ণের গুরু, একমাত্র পতিই স্ত্রীর গুরু এবং অতিথি সকলের গুরু।'

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া।।

(মনুস্মৃতি ২/৬৭)

'স্ত্রীলোকদের জন্য বৈবাহিক বিধি পালন করাই বৈদিক সংস্কার (যজ্ঞোপবীত), পতির সেবা গুরুকুল, বাস এবং গৃহ-কার্যকেই অগ্নিহোত্র বলা হয়েছে।'

পতি ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীলোকদের কোনো রকম সম্বন্ধ জোড়া উচিত নয়। স্ত্রীলোকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন কখনও কোনো সাধুর চক্করে না পড়েন। আজকাল অনেক ঠক, দাম্ভিক, পাষন্ড হয়েছে। আমার কাছে এই রকম অনেক চিঠি আসে এবং ভুক্তভোগী স্ত্রীলোকেরাও আমার কাছে এসে বলেন, যা থেকে বোঝা যায় যে বর্তমানে স্ত্রীলোকদের গুরু করা অর্থাৎ কোনো পুরুষের সংস্পর্শে আসা অনর্থের মূল।

সাধুদেরও উচিত তাঁরা যেন কোনো স্ত্রীলোককে চেলা না করেন। দীক্ষা দেবার সময় গুরুকে শিষ্যের হৃদয় প্রভৃতি স্থান স্পর্শ করতে

হয়। কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোকের দেহ স্পর্শ করার কঠিন নিষেধ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে হাড়-মাংসবিশিষ্ট নারীদেহের কথা ছেড়ে দাও, কাঠের তৈরি নারীদেহকেও স্পর্শ করবে না। হাত দিয়ে স্পর্শ তো নয়ই, পা দিয়েও স্পর্শ করবে না—

পদাপি যুবতীং ভিক্ষুর্ন স্পৃশেদ্ দারবীমপি।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১/৮/১৩)

শাস্ত্রে এমন কথাও আছে—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।।

(মনুস্মৃতি ২/২১৫)

'মানুষের উচিত মা, বোন অথবা মেয়ের সঙ্গেও কখনও একান্তে না থাকা, কেননা ইন্দ্রিয়গুলি বড় প্রবল, সেগুলি বিদ্বান মানুষদেরও নিজেদের দিকে আকর্ষণ করে।'

সঙ্গং ন কুর্যাৎপ্রমদাসু জাতু
যোগস্য পারং পরমারুরুক্ষুঃ।
মৎসেবয়া প্রতিলব্ধাত্মলাভো
বদন্তি যা নিরয়দ্বারমস্য।।

(শ্রীমদ্ভাগবত, ৩/৩১/৩৯)

'যে ব্যক্তি যোগের পরম পদে আরূঢ় হতে চায় অথবা আমাকে সেবা করার প্রভাবে যার আত্মা-অনাত্মার বিবেক হয়ে গিয়েছে সে কখনই স্ত্রীলোকদের সঙ্গ করবে না ; কেননা এই রকম ব্যক্তির কাছে তাদের নরকের উন্মুক্ত দ্বার বলা হয়েছে।'

বিশ্বামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়ো বাতাম্বুপর্ণাশনা-
স্তেঽপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বৈব মোহং গতাঃ।
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং ভুঞ্জন্তি যে মানবা-
স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেদ্বিন্ধ্যস্তরেৎসাগরে।।

(ভর্তৃহরিশতক)

'যিনি বায়ু ভক্ষণ করে, জল পান করে এবং শুকনো পাতা খেয়ে থাকতেন সেই বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতিও স্ত্রীলোকদের সুন্দর মুখ দেখে মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। আবার যারা শালি ধান (পরমান্ন) ঘী, দুধ এবং দইয়ের সঙ্গে খায় তারা যদি নিজেদের ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করতে পারে তাহলে মনে করতে হবে বিন্ধ পর্বত সমুদ্রে সাঁতার কাটছে।'

এই রকম অবস্থায় যিনি যুবতী নারীকে নিজের চেলা করেন, তাকে নিজের আশ্রমে রাখেন, তাঁর স্বপ্নেও কল্যাণ হবে—এমন কথা আমার মনে হয় না। তাহলে তাঁর দ্বারা আপনাদের ভাল হবে কি করে? কেবল প্রবঞ্চনাই হবে।

প্রশ্ন—এমন কথা বলা হয় যে জীবন্মুক্ত মহাত্মা যদি ভোগ করতেই থাকেন তাহলেও তাঁর কোনো দোষ হয় না। এই কথা কি ঠিক?

উত্তর—এমন হতে পারে না। জীবন্মুক্ত হয়ে গেলেন আর ভোগ করতে থাকলেন—এ একেবারেই অসম্ভব। সাধনা করার সময়েই তো ভোগ দূর হয়ে যায়। তাহলে সিদ্ধ পুরুষের ভোগ করবার প্রয়োজন কেন হবে? দাম্ভিক পাষণ্ড লোকেরাই নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এমন কথা বলে থাকে। এজন্য রামায়ণে বলা হয়েছে—

মিথ্যারম্ভ দম্ভ রত জোঈ। তা কহুঁ সন্ত কহই সব কোঈ।
নিরাচার জো শ্রুতি পথ ত্যাগী। কলিজুগ সোই গ্যানী সো বিরাগী।।

(রামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৯৮/২, ৪)।

পর ত্রিয় লম্পট কপট সয়ানে। মোহ দ্রোহ মমতা লপটানে।।
তেই অভেদবাদী গ্যানী নর। দেখা মৈঁ চরিত্র কলিযুগ কর।।

(রামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১০০/১)

বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি।
শুনাং তত্ত্বদৃশাং চৈব কো ভেদোঽশুচি ভক্ষণে।।

'যদি অদ্বৈত তত্ত্বের জ্ঞান হয়ে যাওয়ার পরও যথেচ্ছাচারী হয়ে যান তাহলে অশুদ্ধ বস্তু (মদ, মাংস প্রভৃতি) ভক্ষণে যথেচ্ছাচারী তত্ত্বজ্ঞের সঙ্গে কুকুরের প্রভেদ কোথায় থাকল?'

যস্তু প্রব্রজিতো ভূত্বা পুনঃ সেবেৎ মৈথুনম্।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ।।
(স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড পূ০ ৪০/১০৭)

'যে সন্ন্যাস নেওয়ার পর আবার স্ত্রীসঙ্গ করে সে ষাট হাজার বছর ধরে বিষ্ঠার কীট হয়ে থাকে।'

ভোগের কারণ হল কামনা এবং কামনার সম্পূর্ণ রূপে নাশ হলেই জীবন্মুক্তি হয়ে থাকে। ভোগের কামনা সাধকদের তো প্রারম্ভেই দূর হয়ে যায়। যদি কোনো গ্রন্থে এমন কথা লেখা থাকে যে জীবন্মুক্ত মানুষ ভোগ করলেও তার দোষ হয় না, তাহলে সেই কথা তাঁর মহিমা জানাবার জন্যই লিখিত হয়েছে, এটি কোনো বিধি নয়। এর তাৎপর্য ভোগ করে যাওয়া নয়। যেমন, গীতায় জীবন্মুক্তের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে 'যাঁর অহঙ্কৃত ভাব নেই এবং যাঁর বুদ্ধি লিপ্ত নয় তিনি সকল প্রাণীকে হত্যা করলেও হত্যাকারী হন না এবং বন্ধনেও পড়েন না।*

এর তাৎপর্য এই নয় যে জীবন্মুক্ত মহাত্মা সকল প্রাণীকে হত্যা করে থাকেন।

প্রশ্ন—গুরু করলে তবে তো তিনি শক্তিপাত (দৈবশক্তির প্রয়োগ) করবেন। অতএব গুরু করা আবশ্যক।

উত্তর—শক্তিপাত কোনো তামাশা নয়। বর্তমানে শক্তিপাত দেখা তো দূরের কথা, তা বইতেও প্রায় দেখা যায় না। একজন সাধু ছিলেন। একজন লোক শক্তিপাত করাবার জন্য সেই সাধুর কাছে খুবই জেদ করতে লাগল। সেই সাধুটি বলেছিলেন যে শক্তিপাত কোনো ছেলেখেলা নয়। তা তুমি সহ্য করতে পারবে না, মরে যাবে। লোকটা তবুও জেদ ছাড়ল না এবং কোনো রকমে তা করে দিতে মহারাজকে বলল। সাধু শক্তিপাতের সামান্য প্রভাব দেখাতে লোকটি

---

*যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে।। (গীতা ১৮/১৭)

ঘাবড়ে গেল এবং চেঁচাতে শুরু করল এই বলে যে তার স্ত্রী-পুত্র-মা-বাবা সবাই শেষ হয়ে গিয়েছে। সংসার ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এখন আমি কোথায় যাই? আমাকে বাঁচান। তাৎপর্য হলো শক্তিপাত করা মামুলি লোকের কাজ নয় এবং কোন লোক তাকে সহ্য করতে পারে না।

প্রশ্ন—কেউ যাতে খ্রীষ্টান বা মুসলমান না হয়ে যায়, সেই জন্যই চেলা করা হয়, এতে দোষ কী?

উত্তর—এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। যারা খ্রীষ্টান বা মুসলমান হতে চায় তারা গুরুর কাছে যাবেই না। যদি চেলা না করার জন্য কেউ খ্রীষ্টান বা মুসলমান হয়ে যায় তো তাতে গুরুর দোষ হবে না। কিন্তু নিজের চেলা করে তাকে অন্য জায়গায় যাওয়া আটকে দিলে এবং নিজেও তার কল্যাণ না করলে এই দোষ তো তার হবেই। চেলা হয়ে গিয়ে গুরুর শরণাগত হয়ে গেলে, ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ না জুড়ে গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হলে—এটা খুব বড় অপরাধ।

প্রশ্ন—'গুরু কীজৈ জান কে, পানী পীজৈ ছান কে'—তো গুরুকে জানার উপায় কী? গুরুকে পরীক্ষা কি করে করা হবে?

উত্তর। আপনারা গুরুর পরীক্ষা করতে পারেন না। যদি আপনারা গুরুর পরীক্ষা করতে পারেন তাহলে তো আপনারা গুরুরও গুরু হয়ে গেলেন। যিনি গুরুর পরীক্ষা করতে পারেন তিনি কি কখন গুরুর চেয়ে ছোট হতে পারেন? পরীক্ষক তো বড়ই হন। এই রকম অবস্থায় আপনাদের উচিত কাউকে গুরু না করে সৎসঙ্গ স্বাধ্যায় করা এবং তাতে যা ভাল জিনিস পাওয়া যায় তাকে ধারণ করা। যার সৎ-সঙ্গ করায় পরমাত্মাকে পাওয়ার আগ্রহ বাড়ে, দুর্গুণ-দুরাচার নিজে থেকে চলে যায় এবং সদ্‌গুণ সদাচার আপনা থেকেই এসে যায়, ভগবানের বিশেষ স্মরণ হয়, ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, প্রশ্ন না করেই সংশয় দূর হয়। আমাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার ইচ্ছা যাঁদের থাকে না সেই রকম সাধুদের সঙ্গ করুন। তাঁদের

সঙ্গে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক না জুড়েই তাঁদের কাছ থেকে লাভ তুলে নিন। সেখানে যদি কোনো দোষ দেখেন, কোনো গোলমাল চোখে পড়ে তো সেখান থেকে চলে যাবেন।

বাস্তবে পরীক্ষা গুরুর হয় না, তা নিজেরই হয়ে থাকে। এই বিষয়ে একটি গল্প আছে। এক অল্প বয়স্ক রাজা ছিলেন। তিনি রাজ্যের বৃদ্ধ এবং বুঝদার লোকদের ডেকেছিলেন এবং বলেছিলেন, আপনারা সত্য করে জানান যে আমার দাদুর সময়ে নাকি আমার বাবার সময়ে অথবা আমার সময়ে রাজ্য ঠিকভাবে চলছে। আপনারা তিনজনের রাজ্য দেখেছেন। কার রাজ্য শ্রেষ্ঠ? এই কথা শুনে সবাই চুপ করে ছিলেন। তখন তাঁদের মধ্য থেকে এক বৃদ্ধ বলেছিলেন, 'মহারাজ, আমরা আপনার প্রজা। আপনি আমাদের মালিক। আপনার কথার নির্ণয় আমরা কি করে করতে পারি? আমরা আপনাদের পরীক্ষা করতে পারি না। কিন্তু আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন তো আমি নিজের কথা বলতে পারি।' রাজা বলেছিলেন—বেশ, তোমার কথাই বলো। সেই বৃদ্ধ লোকটি বলেছিল—যখন আপনার পিতামহ রাজত্ব করতেন তখন আমি বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক। আমার হাতে লাঠি থাকত। কুস্তি করা, লাঠি খেলা এসব আমি জানতাম। এক দিন যখন আমি যাচ্ছিলাম তখন জঙ্গলের মধ্য থেকে কান্না শুনতে পেলাম। আওয়াজ শুনে মনে হলো কোনো স্ত্রীলোকের কান্না। কেননা স্ত্রীলোকের পঞ্চম স্বর হয়। ষড়জ বা প্রথম স্বরটি হয় না। আমি সেই দিকে গিয়ে দেখলাম যে একজন ভাল বস্ত্রে ও গহনায় সজ্জিত স্ত্রীলোক বসে বসে কাঁদছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন কাঁদছ? সে আমাকে দেখে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে ভরসা দিয়ে বলেছিলাম, মেয়ে, ভয় পেও না, তোমার কথা আমাকে বল। সে বলেছিল যে সে আত্মীয়দের সঙ্গে বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছিল। রাস্তায় ডাকাত এসেছিল এবং তাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গীদের লড়াই হয়েছিল। আমি ভয়ে জঙ্গলে পালিয়ে এসেছিলাম।

তারপর কী হয়েছিল আমার জানা নেই। এখন আমি কোথায় যাব, কী করব? বাপের বাড়ি বা শ্বশুর বাড়ি যে কোথায় তা আমার জানা নেই। আমি তাকে শ্বশুর বাড়ির নাম জিজ্ঞাসা করায় সে গ্রামের নাম বলেছিল। আমি তাকে বলেছিলাম যে তোমার শ্বশুর বাড়ির গ্রাম কাছেই, আমি তোমাকে পৌঁছিয়ে দেব। ভয় কোরো না। আমি তাকে শ্বশুরের নাম জিজ্ঞেস করায় সে মাটিতে তা লিখে দিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, আমি তোমার শ্বশুরকে জানি। আমি পৌঁছিয়ে দেব।

রাত্রি হয়েছিল, আমি সেই নারীকে নিয়ে তার শ্বশুরের বাড়ি পৌঁছাই। সেখানে সবাই বলাবলি করছিল, আমরা তো ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করছিলাম। ডাকাতরা নিশ্চয় আমাদের বউকে মেরে ফেলেছে। তার গায়ে তো কয়েক হাজার টাকার গয়না ছিল। নিশ্চয় ডাকাতরা সেগুলি লুঠ করে নিয়েছে। এখন কি করে তার সন্ধান করা যাবে? ইত্যাদি। নিজেদের বউকে দেখে তারা খুব খুশী হয়েছিল। সেই স্ত্রীও বাড়ির সব মেয়েদের বলেছিল, ইনি বাবার মতো স্নেহপরায়ণ, যত্নসহকারে আমাকে এখানে এনেছেন। তারা আমাকে চার-পাঁচশো টাকা নিতে বলেছিল। আমি বলেছিলাম যে টাকার জন্য আমি এই কাজ করিনি। কোনো মজুরী তো করিনি। আমি নিজের কর্তব্য মনে করে এই কাজ করেছি। তারা অনেক করে বলা সত্ত্বেও আমি কিছু নিইনি। আমি সেখান থেকে চলে গিয়েছিলাম। এক অবলার সেবা আমি করেছি, সেজন্য আমার মনে প্রসন্নতা ভরে গিয়েছিল। এটি তখনকার কথা, যখন আপনার পিতামহ রাজত্ব করতেন।

তারপর অনেক দিন চলে গিয়েছে। আমার ব্যবসায়ে লোকসান হচ্ছিল এবং টাকা-পয়সার খুব টানাটানি চলছিল। তখন আমার মনে হয়েছিল যে সেই মেয়েটিকে ছেড়ে আমি খুব ভুল করেছি। তাকে একটু আঘাত করলেই দশ-পনের হাজার টাকার গয়না পেয়ে যেতাম। তাহলে আজ আর এত টানাটানিতে পড়তে হোত না। তার শ্বশুরও টাকা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি নিইনি। কিন্তু এখন আর কী হবে,

সুযোগ তো হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। এটি তখনকার কথা যখন আপনার বাবা রাজত্ব করছিলেন। আর এখন মহারাজ, আপনার কাছে বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে। কেননা আপনি তো আমার নাতির মতো। কিন্তু আপনি যখন জিজ্ঞাসা করছেন তখন আমি বলছি। এখন আমার মনে হচ্ছে যে সেই মেয়েটিকে বকে, ভয় দেখিয়ে অথবা ফুসলে যদি নিজের স্ত্রী করে নিতাম তাহলে স্ত্রীও পেতাম এবং গয়নাও পেয়ে যেতাম। আজকের এই অবস্থায় দুটিই আমার কাজে আসত। আমি নিজের কথা বলে দিলাম। আপনার রাজ্য কিরকম, তা আমি কেমন করে বলি? রাজা বুঝতে পেরেছিলেন যে বৃদ্ধটি খুবই চালাক। নিজের অবস্থা জানিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে রাজা যেমন হয়, প্রজাও তেমনই হয়— "যথা রাজা তথা প্রজা'।

তাৎপর্য হলো আমরা গুরুর পরীক্ষা তো করতে পারি না, কিন্তু তাঁর সঙ্গ লাভ করে আমাদের ভাবের উপর কী প্রভাব পড়েছে তার পরীক্ষা করতে পারি। আমাদের আচরণের উপরেই বা কী প্রভাব পড়েছে? আমাদের জীবনের উপরে কী প্রভাব পড়েছে? আমাদের রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ কতটা কমেছে?

প্রশ্ন—ইতিহাসে এমন উদাহরণ আছে যাতে গুরু করা অনিবার্য প্রমাণিত হয়।

উত্তর—ইতিহাসের আধারে সত্য নির্ণয় হতে পারে না। ইতিহাসের কথা অকাট্য নয়। কারণ কোনো লোক কোন্ সম্পর্কে এবং কী পরিস্থিতিতে কী করেছে এবং কেন করেছে তার পূর্ণ পরিচয় জানা যেতে পারে না। তাই ইতিহাসের ভাল কথা থেকে মার্গদর্শন তো হতে পারে, কিন্তু সত্যের নির্ণয় শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের দ্বারাই হতে পারে। ইতিহাসের চাইতে বিধি প্রবল এবং বিধির চাইতেও নিষেধ প্রবল।

গুরু সম্পর্কে বেশি বেশি কথা যাদের গুরু হওয়ার সখ তারাই প্রচার করেছে। অতএব বর্তমান কলিযুগে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে।
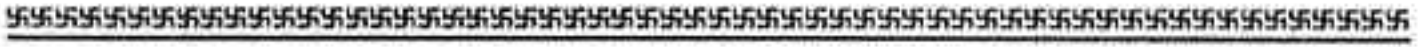
(১৫) সন্ন্যাসী সাধক এবং কীর্তনীয়াদের প্রতি নম্র নিবেদন

[এই লেখাটি অনেক আগে 'কল্যাণ' মাসিক পত্রিকার নবম বর্ষে (সংবত ১৯৯৬, সন ১৯৩৪-এ) প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান সময়ে এটির বিশেষ উপযোগিতা থাকায় এখানে পুনরায় উদ্ধৃত করা হচ্ছে।]

শ্রীপরমাত্মদেব এবং তাঁর অনেক ভক্তের কৃপা ও আদেশক্রমে আজ আমি এখানে সন্ন্যাসী সাধকদের আচরণ এবং কীর্তনের বিষয়ে সেই ভাবগুলি লিখতে চেষ্টা করছি যা আমার খুবই প্রিয়। যদিও আমি নিজেকে লেখবার এবং এইভাবে আদেশ-উপদেশ দেবার কোনো রকম অধিকারী বলে মনে করি না, আর আমার দ্বারা এই রকম আচরণ যথাযথভাবে পালিত হয় না। তবুও শাস্ত্রীয় তথা সাধুদের শ্রদ্ধেয় আচার-বিচার আমার প্রিয় মনে হয়। সেজন্য এই রকম আলোচনায় সময় বাহিত করাতে নিজের পরম ভাগ্য মনে করে কিছু প্রয়াস করছি। আশা করি আমার অন্যান্য সাধক ভাইয়েরাও এই রকম মতামত কখনও কখনও প্রকট করবেন। তাহলে আমাদের মতো লোকেরাও সেই মতামত পড়তে পারবেন এবং সেই ভাইদেরও কিছু সময় সৎচিন্তায় অতিবাহিত হবে। সাধু-সন্তের এবং শাস্ত্রের যেসব কথা সৎসঙ্গে আমি শুনে এবং গ্রন্থ পাঠ করে এখানে কিছু লিখছি, তার মধ্যে যদি অনুচিত কিছু থেকে থাকে তাহলে বিজ্ঞ মহানুভব পাঠকেরা আমাকে তাঁদের সন্তান মনে করে অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন।

সাধকদের হর্ষ, শোক, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকার চেষ্টা করা উচিত। অন্তত এগুলির বশীভূত হওয়া উচিত নয়।

সাধারণ মানুষেরা যেমন ভূত, প্রেত, সাপ, বাঘ প্রভৃতিকে ভয় করে আমাদের মতো লোকেদের সেই রকমভাবেই রাগ-দ্বেষ-রূপ কামিনী এবং কাঞ্চনকে ভয় করা উচিত। আর এই কথাও বোঝা উচিত যে, যে মুহূর্তে সাধকদের কামিনী কাঞ্চনের প্রতি আসক্তি হয় সেই মুহূর্তেই তাঁদের পতন হয়ে যায়।

একথা কখনই মনে করা ঠিক নয় যে রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ প্রভৃতি অন্তঃকরণের ধর্ম। এ ধর্ম নয়, এ হলো বিকার। যে একে অন্তঃকরণের ধর্ম বলে মনে করে সে এটি অন্তঃকরণের কারণে শরীর নাশ হওয়া পর্যন্ত থাকবে বলে মনে করে। তার ফলে সে নিজেকে জ্ঞানী মনে করে এই কথাই ভেবে নেয় যে, যতদিন অন্তঃকরণ আছে ততদিন রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধাদিও থাকবে। এতে আমার কী সম্বন্ধ? বাস্তবে এরকম মনে করা ভুল। যে এরকম মনে করে এবং রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে না সে জ্ঞানী তো নয়ই, উত্তম সাধকও নয়।

এটি বুঝে নেওয়া দরকার যে প্রকৃত জ্ঞানীর মধ্যে কাম-ক্রোধ প্রভৃতি দোষ থাকতেই পারে না। যিনি ভাল বলতে পারেন তিনি শাস্ত্র বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের সুন্দর ব্যাখ্যা করতে পারেন এবং যিনি জ্ঞানের উপর ভাল ভাল তর্কপ্রধান প্রবন্ধ লিখতে পারেন, তিনি জ্ঞানী এমন কথা মনে করা ঠিক নয়। এই সব কথা তো বই পড়লেই জানা যায়। নাটকেও শুকদেবের পার্ট করা যায়। জ্ঞানী তো তিনিই, যিনি অজ্ঞানের সমুদ্র ভালভাবে পার করে গিয়েছেন। রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধাদি অজ্ঞানেই থাকে, জ্ঞানে এর লেশমাত্র থাকে না।

যেসব লোক ব্রাহ্মী স্থিতি পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই বই-এর জ্ঞানের আধারে নিজেকে জ্ঞানী মনে করে থাকেন এবং বিধি-নিষেধ থেকে নিজেকে মুক্ত মনে করে সাধনা ছেড়ে দেন, তাঁদের প্রায়ই পতন হয়। কারণ যতক্ষণ অজ্ঞানতা থাকে ততক্ষণ ইন্দ্রিয় ভোগে আসক্তিই

থাকে। আর পাপ হওয়ার প্রধান কারণ তো ভোগাসক্তি। আবার যেখানে কাম-ক্রোধাদিকে অন্তঃকরণের অনিবার্য ধর্ম মনে করে নেওয়া হয় তার কথা আর বলার কী আছে? অতএব আমাদের মতো সাধকদের খুব সাবধানে দুর্গুণগুলি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে। রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধাদি দোষ থেকে সর্বদা বাঁচতে হবে। সন্ন্যাসাশ্রমে সাধকদের কখনই ভুলেও নারী ও ধনের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক করা উচিত নয়। এদের সঙ্গে সঙ্গ করা উচিত নয়। যিনি সিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁর মধ্যে তো এমন কোনো দোষ থাকতেই পারে না।

এটি মনে রাখা দরকার যে ঠক-জ্ঞানী হওয়া অপেক্ষা অজ্ঞানী থাকা ভাল ; তার পাপের ভয় থাকে। যে ঠক সে তো জেনে শুনে শঠতাকে রক্ষা করবার জন্য পাপ করে। এজন্য শঠতাকে কখনও কল্পনাতেও স্থান দিওনা। প্রকৃত সন্ন্যাসীই হতে হবে—

যাবদায়ুস্ত্বয়া বন্দ্যো বেদান্তো গুরুরীশ্বরঃ।
মনসা কর্মণা বাচা শ্রুতেরেবৈষ নিশ্চয়ঃ।।

(তত্ত্বোপদেশ ৮৬)

আচার্য চরণের এই উক্তি অনুসারে শাস্ত্রের বিধি সর্বদা মেনে চলা উচিত। সন্ন্যাসীর পালনযোগ্য কয়েকটি ধর্ম হলো— গৃহস্থের সঙ্গ করবে না। মেয়েদের ছবিও দেখবে না। অর্থ স্পর্শ করবে না। কারও সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে না। কোন কিছুতেই মমতা রাখবে না। মান-সম্মান গ্রহণ করবে না। খুব সাবধানে বৈরাগ্য রক্ষা করবে। ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযমে রাখবে। বস্তুসংগ্রহ করবে না। দল গঠন করবে না। ঘর বাঁধবে না। বাজে কথা বলবে না। ব্রহ্মচর্য পালন করবে। কাম-ক্রোধ-লোভ প্রভৃতি থেকে মুক্ত থাকবে। কাউকে দ্বেষ করবে না। কারও প্রতি অনুরক্ত হবে না। নিজ আত্মচিন্তনে অথবা ভগবৎ স্মরণে রত থাকবে।

যে সন্ন্যাসী তার এই সন্ন্যাস-ধর্ম পালন করে না তার প্রায়শই

পতন হয়। সেজন্য নিজের আশ্রম-ধর্ম পুরাপুরি পালন করা উচিত। বিধি-নিষেধ উত্তীর্ণ হয়েছেন এমন মহাপুরুষেরাও লোকসংগ্রহার্থ আদর্শ শুভ কর্ম করতে থাকেন।

যদি ভক্ত হওয়ার বাসনা থাকে তাহলে ভগবানের শরণাগত হয়ে সর্বদা ভগবানের ভজনা করা উচিত। ধন, মান, সম্মান প্রভৃতির বাসনাকে মনে আসতে দেওয়া উচিত নয়। লোকেরা ভক্ত বলবে কি বলবে না তার জন্য ভাবনা ছেড়ে দেবে। প্রেমের সঙ্গে ভগবানের নাম ও গুণকীর্তন করে যাওয়া উচিত। যতদূর সম্ভব নিজের ভক্তিকে প্রকাশ হতে দিও না। লোকেরা আমাদের পূজা করবে, আমাদের সম্মান করবে এমন অবকাশ হতে দিও না। মান-মর্যাদা থেকে সর্বদা সাবধান থাকবে। নারী এবং নারীদের সঙ্গীদের সঙ্গে কখনই সঙ্গ করবে না। মনের মধ্যে যেন ধনের লোভ না হয়, প্রতিষ্ঠাকে শূকরের বিষ্ঠা মনে করবে।

কীর্তন করা উচিত, খুব বেশী কীর্তন করা উচিত। কিন্তু তা করা উচিত ভগবানের প্রীতি কামনায়, লোকরঞ্জনের জন্য নয়। লোক-রঞ্জনের কীর্তন বাহ্যিক। যিনি কীর্তন করবেন তাঁর মনে এই দৃঢ় ভাব থাকা উচিত যে ভগবান অবশ্যই উপস্থিত রয়েছেন এবং আমি তাঁর সামনে তাঁকে প্রীত করবার জন্য তাঁর নাম-গান করছি। ভগবানের নাম-গানের অর্থ চিন্তন করার সময়—ভগবানের ধ্যানস্থ হয়ে কীর্তনে মগ্ন হয়ে যেতে হবে। যদি এমন ভাব না হয় তাহলে এই ধরনের অভ্যাস করতে হবে। কিন্তু এমন কথা ভাবা উচিত নয় যে, আমার এই কীর্তনে লোকেরা অর্থাৎ শ্রোতারা খুশী হলেন কিংবা তাঁদের মন আমার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। ভগবানের নামে শ্রদ্ধা আনুন, প্রেমাসক্ত হন আর শ্রদ্ধা ও প্রেমে গ্রথিত হয়ে ভগবানের নাম উচ্চারণ করুন। তাহলে আপনার মুখ থেকে উচ্চারিত একটি নামই চমৎকারিতা সৃষ্টি করবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখ থেকে নির্গত একটি নামই

শ্রোতাদের পাগল করে দিত; কেননা সেই নামের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের প্রেমশক্তি ভর্তি থাকত।

আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। ভগবানের কীর্তন যাঁরা করবেন, তাঁদের সদাচারী হতে হবে। তাঁদের দৈবী সম্পত্তিবান হতেই হবে। যাঁরা ভগবানের নাম নিয়ে নৃত্য-গীত করেন, কিন্তু তাঁদের আচরণ শুদ্ধ নয়, জনতার উপর তাঁদের ভাল প্রভাব পড়ে না। লোকেরা তাঁদের আদর্শ মনে করে তাঁদের আচরণের দিকে মন দেয় না। তার ফলে লোকেরা কীর্তন, কীর্তনীয়া এবং এমনকি ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও আক্ষেপ করার সুযোগ পেয়ে যায়। সেজন্য আমাদের উচিত দায়িত্ব বোঝা। আমাদের আচরণের ফলে যেন সংকীর্তন ও আমাদের ভগবানের উপর কলঙ্ক না লাগে। বাস্তবে পবিত্র সংকীর্তন এবং ভগবানের উপর তো কলঙ্ক লাগতেই পারে না। তাহলেও কেবল বলার জন্যেও আমাদের দোষ থেকে যেন এমন না হয়।

আচরণ শুদ্ধ না হলেও কীর্তন করা উচিত। তবে তা একান্তে। আচরণের শুদ্ধির জন্য ভগবানের কাছে কাঁদা উচিত। ভগবানের কাছে ভিক্ষা চাওয়া উচিত। কিন্তু সাবধান! সংকীর্তনের নামে দুরাচারকে যেন কখনও গোপন করা না হয়। আর দুরাচারের সমর্থন তো কোনো অবস্থাতেই করা উচিত নয়।

সংকীর্তনের নামে বর্ণ ও আশ্রমের কাজে কখনও অবহেলা বা উপেক্ষা করা উচিত নয়। স্বধর্মে পালনরত থাকা অবস্থাতেই কীর্তন করতে হবে। সংকীর্তনের নামে জ্ঞান, বৈরাগ্য, সদাচার, বর্ণাশ্রমধর্ম এবং সন্ধ্যা-গায়ত্রীর কখনও নিন্দা করা উচিত নয়। বরং এগুলিকে অবশ্য পালনীয় মনে করা উচিত, এগুলিকে সম্মান করা উচিত এবং যথাযোগ্য শাস্ত্র বিধান অনুসারে পালন করা উচিত।

সংকীর্তনের নামে পক্ষপাতিত্ব অথবা ভগবানের নামে উচ্চ-নীচ ভেদবুদ্ধি কিংবা দলবাজী করা উচিত নয়। সংকীর্তনের জন্য সংগঠন

গড়া উচিত কিন্তু দলবাজী করা উচিত নয়। সরল, পবিত্র, অকপট, নিষ্কাম, অনন্য প্রেমভাবে ভগবানের পবিত্র নাম নিজে গাওয়া উচিত এবং অন্যকে এরকম করতে অনুপ্রাণিত করা উচিত। তবে যথাসম্ভব উপদেশক, নেতা এবং আচার্য হওয়া উচিত নয়। পূজা, সৎকার, মান, মর্যাদা প্রভৃতি থেকে নিজেকে সর্বদা রক্ষা করা উচিত। অর্থ এবং নারীর লোভে তো কখনই পড়া উচিত নয়।

সংকীর্তনের সময় মুক্তকণ্ঠে ভগবানের নাম ঘোষণা করতে হবে। জ্ঞান, বিদ্যা, পদ, ধন প্রভৃতির অহঙ্কারে চুপ করে বসে থাকা ঠিক নয়। কীর্তন যদি দাঁড়িয়ে করতে হয় তবে সংকোচ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। আমাদের আচরণে যেন কখনও ভগবানের নাম কীর্তনের অবমাননা না হয়। তবে প্রেমাবেশ হলেই নৃত্য করবেন, লোককে দেখাবার জন্য করবেন না। কলার দৃষ্টিতে নৃত্য এক রকম এবং প্রেমময় ভগবানের নামকীর্তন অন্য রকমের।

মনে রাখতে হবে যে ভগবানের নাম কীর্তন খুবই শ্রদ্ধেয় এবং উচ্চ সাধনা। খুবই উচ্চ ভাবনা নিয়ে এই সাধনা করা উচিত। সর্বশ্রেষ্ঠ আচরণে যুক্ত হয়ে কীর্তন করা উচিত। পবিত্র পুরুষের দ্বারা ভগবানের নামকীর্তনের ধ্বনি যতদূর পৌঁছাবে সেখানকার সমস্ত জীবের সহজেই কল্যাণ হয়ে যেতে পারে।

—স্বামী রামসুখদাস